শিক্ষা-আগমনী

দৃষ্টিকোণ

মুখোমুখি

প্রথম সংখ্যা । অক্টোবর ২০২৩

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপণ বিভাগ, ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া

রাজ্যে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু

ফের বাংলার মুকুটে নয়া পালক

'কবিগুরু মানে, ছাতিমতলার গল্প,
কবিগুরু মানে বিশ্বভরা প্রাণ।'(স্বরচিত)

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন। গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর, রবিবার UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে শান্তিনিকেতনের নাম ঘোষণা করে।— ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৭৫-এ বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলন শুরু করে। স্থির হয়, সারা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চমানের ও অসামান্য ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হবে। কোন কোন স্থানকে নির্ধারিত করা হবে, তা স্থির করবে এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। তাঁরা ওই তালিকায় কোনও ঐতিহাসিক স্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শন পরীক্ষা করবেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। ১৯৮৩ ভারতের চারটি ঐতিহাসিক স্থান স্বীকৃতি পেয়েছিল: তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা আর আগরা ফোর্ট। এত দিন পর বিশ্বের ঐতিহ্যের আসরে ভারত স্থান পেল। পরের বছর কোনার্কের সূর্য মন্দির আর তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম এই সম্মান পেল। ১৯৮৫-তে ভারত তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকে প্রথম বারব্রচিই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হল। দু'টি জাতীয় উদ্যান— কাজিরাঙা ও কেওলাদেও এবং মানস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে এই সম্মানে ইউনেস্কো ভূষিত করল।

ইতিমধ্যে বিশ্ব জুড়ে ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আছে ৯৩৩টি, যার মধ্যে ভারতে মাত্র ৪২টি। এতে দার্জিলিঙের টয় ট্রেন, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসাবে কুতব মিনার, লাল কেল্লা, খাজুরাহো, এলিফ্যান্টা গুহা, মহাবোধি ও চোল আমলের মন্দির, রাজস্থানে পার্বত্য দুর্গ, জয়পুরের যন্তর মন্তর, গোয়ার গির্জা। যার মধ্যে নয়া সংযোজন বাঙালির প্রানের শান্তিনিকেতন।

মৌপিয়া সরকার (5th Semester)
ছবি : গুগল

হাওড়ার প্রাচীনতম ৫২ নং রুট ও শহরের শেষ কাঠের বাসের অভিনব যাত্রা উদ্যোগে: kolkata-bus-o-pedia

দিনটা ছিল ৯ই জুলাই, kolkata-bus-o-pedia তত্ত্বাবধানে মহানগরীর বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক স্মরণীয় বাস যাত্রা। ৫২নং বাস রুটের শত বর্ষের পূর্তি, ও ৫৬ নং রুটের একটি বাস যা আমাদের শহরে শেষ কাঠের বাস, ও WBTC এর তরফ থেকে ইলেকট্রিক বাস নিয়ে ছিল এই বাস যাত্রা। এই যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমরা, ড:কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ছাত্রছাত্রী হিসেবে, মৌপিয়া, আশীস, রাহুল, শ্রেয়া, সুদীপ্তা, ও শ্রেয়া। রামরাজাতলা থেকে ধর্মতলা ও ময়দানে এসে শেষ করা হয়েছিলো এই বাস যাত্রা।

ইতিমধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা মত সকাল ৯:৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম রাম-রাজাতলায় নতুন ৫২নং বাস স্ট্যান্ডে। গিয়ে দেখলাম ততক্ষণে বাস যাত্রায় যাওয়ার জন্য বেশ কিছু লোকজন হাজির হয়েছেন। আলাপ হল পল্টু ভট্টাচার্য মহাশয় এর সাথে, কথায় কথায় জানতে পারলাম, তিনি ড:কানাইলাল ভট্টাচার্যের ভাইপো, জানালেন ৫২ নং বাস এবং এই রুটের ইতিহাস ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা তাঁর কিছু স্মৃতি।

সাধারণত একসময় রামরাজাতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার সবথেকে সহজ উপায় ও একমাত্র ভরসা এই বাস। তিনি এই বাসের ও রুট এর ইতিহাস সম্পর্কে বলেন - এই রুট প্রথম শুরু হয়েছিলো ১৯২৪ সালে, এই এলাকার পূর্বপুরুষ জ্ঞান রায়, তার বাবা ছিলেন তখনকার বড়র্লাটের পি.এ, উনি তখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে এই এলাকায় বাস দেওয়ার জন্য তখন থেকে এই রুট এর জন্ম, তিনি আরও বলেন, এখনকার মত তখন তো ডিজেল, পেট্রোল ছিল না তাই কাঠ কয়লা পুড়িয়ে গ্যাস তৈরি করা হত কুলগ্যাস তাই দিয়ে বাস চলত, তখন বাসের আকারও অন্য ধরণের ছিল। ৫২নং বাসের সামনেটা ছিল অ্যালবাট কার্টিং এর। তাঁর ছোটোবেলার স্মৃতি হিসেবে জানিয়েছেন তাদের মা কাকিমারা যখন সিনেমা দেখতে যেত এই বাসই ছিল একমাত্র উপায় এবং এই বাসে করে তারা স্কুলে যেত। তিনি আরও বললেন, দালালপুকুরের যে রেলিংটা তার কারণও এই ৫২নং বাস, কারণ একদিন ওই পুকুরে বাস পরে যায়, সেই থেকে ওই রেলিং দিয়ে ঘেরা।

এই সব কথা হতে হতে দেখলাম যে ৫২ বাসটিকে নিয়ে এই যাত্রা সেটি ইতিমধ্যেই চলে এসছে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাসটিকে, আমরা সবাই উঠে পড়লাম বাসে, উঠে দেখি সুন্দর একটা প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে, তাতে ছিল পুরোনো দিনের টিকিট, পুরোনো বাসের ছবি, কিছু ইতিহাস। তার কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ৫২নম্বর পুরানো বাস স্ট্যান্ডে সকাল ১০:৩০ নাগাদ।

সেখানে কেক কেটে যাত্রা শুরু করেন ৫২নং বাস রুটের সেক্রেটারি শ্রী ভোলানাথ চৌধুরী। এরপর সবাই মিলে রওনা হলাম ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে ময়দান পৌঁছে গেলাম, ময়দান থেকে আমদের সাথে যুক্ত হল ৫৬ নং কাঠের বাস ও WBTC AC বাস। তার মাঝে কথা হল kolkata-bus-o-pedia এর প্রেসিডেন্ট সৌভিক মুখার্জির সাথে যিনি এই অনুষ্ঠানে মূল কান্ডারী।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, সরকার ও কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবি বা অনুরোধ, এই যে একটা রুট স্বাধীনতার আগে যার জন্ম, এরপর দেশ স্বাধীন হল, কত বছর পেরিয়ে গেলো কিন্তু আজও ৫২নং বাস রুট জীবিত, ১০০ বছর ধরে। তাই এই ঐতিহাসিক রুটকে হেরিটেজ রুট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ও কাঠের বাসকে যাতে সংরক্ষণ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

বেলা ১২ টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার একদম সামনে, সেখানে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কথা বললাম কাঠের বাসের চালকের সাথে, তিনি বললেন, বিগত ৩০ বছর ধরে এই বাস চালাচ্ছেন, আর দুই বছর এই বাসের আয়ু, এর মধ্যে যদি বাসটি চলে তাহলে তিনি চালাবেন।

এর পর কথা হল kolkata-bus-o-pedia প্রাণপুরুষ অর্ণব বাবুর সাথে, উনি আমদের এই অনুষ্ঠানের অন্য আর এক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় করালেন, তার বক্তব্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের আরও এক বিষয় হল, কাঠের বাস >স্টিল বডি বাস> ইলেকট্রিক বাস। এই ভাবে বাসের যে বিবর্তন সেটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁরা। কারণ বর্তমানে সব কিছুই বদলাচ্ছে, আধুনিক থেকে আধুনিকতর পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তাই বর্তমানের সাথে তালমিলিয়ে বাসের যে বিবর্তন তাই দেখানো হয়েছে। তাদের আসল পরিকল্পনা হল কলকাতা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থা সংঘবদ্ধ করার, তাই তাদের একটি ওয়েবসাইট আছে যেখানে source ও destination জায়গার নাম দিলে কি কি বাস রুট অ্যভেলেবল তা চলে আসবে, এই ভাবে সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থাকে একই ছাতার তলায় আনার প্রচেষ্টাতে আছেন।

উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার DM মহাশয়, তিনি ৫২ নং বাসের মধ্যে এক্সজিবিশান, ৫৬ নং কাঠের বাস, ও WBTC এর ac বাসে পরিক্রমা করেন, এর পর ১:৩০ নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা সকলে রওনা হলাম ময়দানের উদ্দেশ্য। আবারো ময়দানে শরৎ সদনের কাছে এসে থামলো বাস,স্কাউট বয়রা রাস্তায় প্যারেড প্রদর্শন করেন। বেলা ২:০০ নাগাদ অবশেষে বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা হলাম, যে ৫২নং বাসে আমরা ধর্মতলা গিয়েছিলাম সেই বাসই আমদের গন্তব্যে নামিয়ে দেয়।

এমন একটি অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার, এহেন মহান আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানাই kolkata-bus-o-pedia, ও kolkata-bus-o-pedia,প্রাণপুরুষ অর্ণব বাবু ও এই অনুষ্ঠানের কান্ডারি শ্রী সৌভিক মুখার্জি মহাশয়কে।

অনুলিখন সুদিপ্তা

নিজস্ব চিত্র

আমাদের কলেজ

প্রতিষ্ঠা

২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা আরে তৃণ সম দহে...'

শিক্ষাঙ্গন হোক সংবেদনশীল

#NO_RAGGING

প্রচারে: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
ডা. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া

THE VISION

The Journalism Department, a cornerstone of our esteemed academic institution, has been a vital component of our educational journey since its inception. For decades, it has stood as a bastion of journalistic integrity, innovation, and excellence, nurturing generations of passionate storytellers and reporters. As a faculty member who has been part of this department from its inception, I've had the privilege of witnessing its growth and evolution firsthand.From its early days, the Journalism Department was established with a clear vision: to train and educate aspiring journalists to become the watchdogs of democracy, champions of free speech, and conveyors of truth. The department's commitment to these ideals has remained unwavering throughout the years.One of the defining characteristics of our department is the diverse and accomplished faculty it has gathered over the years. Together, we have tirelessly pursued excellence in teaching and mentoring, inspiring students to think critically, write effectively, and uphold the highest ethical standards.The Journalism Department has always been at the forefront of adapting to the evolving media landscape. In the early years, we focused primarily on print journalism, emphasizing the importance of investigative reporting, news writing, and journalistic ethics. As technology advanced, so did our curriculum. We integrated digital media, multimedia storytelling, and data journalism into our courses, equipping students with the skills needed to thrive in the digital age.As we look to the future, the Journalism Department remains committed to its core principles while adapting to the ever-changing media landscape. We continue to explore emerging trends in journalism, including immersive storytelling, artificial intelligence in newsrooms, and the ethical implications of digital journalism. Our goal is to prepare students not only for the challenges of today but also for those that lie ahead.In conclusion, the Journalism Department has been an integral part of our institution's academic heritage from its inception. With a dedicated faculty, a commitment to excellence, and a willingness to evolve with the times, we have nurtured generations of journalists who have left their mark on the world of media. As we move forward, we remain steadfast in our mission to empower the next generation of truth-seekers and storytellers.

- Samprikta Bagchi, Faculty

গণতন্ত্রের নিরপেক্ষ প্রহরী

বর্তমানে দ্রুত বিকশিত তথ্যযুগ এবং ডিজিটাল মিডিয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতার ভূমিকা একই সাথে আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও সমালোচনামূলক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি আরও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া কাঙ্ক্ষিত যা কেবল একটি উচ্চ আদর্শ নয়, সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি সত্য, এবং সমাজের উন্নতির প্রতি অবিচল অঙ্গীকার বদ্ধ হবে এটাই কাম্য, যা গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের অবিচল চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সাহায্য করবে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের ইতিহাস ঐতিহ্যবাহী, জাতীয়তা বোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত, রয়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, দুর্নীতি উন্মোচন এবং সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলার সমৃদ্ধ ইতিহাস। জনসাধারণের কাছে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে,, দায় রয়েছে নাগরিকদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার। যদিও মুক্ত বানিজ্য নীতির ফল স্বরূপ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মিডিয়ায় কর্পোরেট প্রভাব, মনোপলি সৃষ্টি, চাঞ্চল্য এবং ভুল তথ্যের বিস্তারের মতো বেশ কিছু সমালোচনার সম্মুখীন, তবে তা অবশ্যই বিস্তর আলোচনার অবকাশ রাখে।

যাইহোক, ভারতের মতো বৈচিত্র্যময়দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখতে স্বাধীন-নিরপেক্ষ গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- সমতা চক্রবর্তী, Faculty

সম্পাদকীয় বার্তা

দৃষ্টিকোণ একঝাঁক তরুণের অনভিজ্ঞ কলমের প্রয়াস, ওদের ভুলভ্রান্তির গঠনগত সমালোচনা, ও উপদেশ একান্তকাম্য।

সকলকে আসন্ন শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

dristikonjorg23@gmail.com

প্রিন্সিপাল কর্ণার

উদ্দেশ্য ছিল দৃষ্টিকোণের প্রিন্সিপাল কর্ণারে একটি লেখা সংগ্রহ করা। সেই সূত্রে গুটি গুটি পায়ে প্রিন্সিপালের কাছে হাজির হয়েছিল মৌপিয়া, শ্রেয়া, সুদীপ্তা, শ্রেয়া, আশীষ, রাইমা, রিয়া, ও পামেলা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। শুরুটা হল বর্তমান নয়া শিক্ষা নীতি NEP 2020 এর ভালো-মন্দ নিয়ে। এই শিক্ষা নীতিতে কীভাবে একজন শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে , ভবিষ্যতে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সহ নানা তথ্য কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য বললেন তিনি। এরপর নানা বিষয়ে কথা বলতে জেনে নিলাম স্যার এর পূজোর ছুটি কেমন কাটে !

এবছর থেকে যে নতুন শিক্ষানীতি শুরু হল এ সম্পর্কে আপনার কী মত ?

আমরা ব্যক্তিগত মত ছাত্রছাত্রীদের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করা, এবং সেই দক্ষতাকে তারা কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন পেশাগত দিকে যে সুযোগ রয়েছে, সেই গুলিতে যাতে ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করতে পারে এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে এই বিষয়কে মাথায় রেখে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তৈরি করা হয়েছে।

মূল বিষয়টি হলো, চার বছরের এই কোসটির শেষে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এটা ভালো একটা দিক।

আপনার কী মনে হয় এই education system ভবিষ্যতে শিক্ষার ওপর কেমন প্রভাব ফেলতে পারে?

যখনই কোন নতুন পলিসি চালু হয়, সেটা অর্থনীতি, সামাজিকনীতি, রাজনৈতিকনীতি সেই পলিসিটি বোঝার জন্য, আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রথমবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা নতুন এডুকেশন পলিসিতে পড়ছে। তাদের থেকে বড় দাদা-দিদিরা CBCS পলিসিতে পড়াশোনা করছে। আমার ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী CBCS পলিসিতে কোন পর্যালোচনা আমি দেখতে পাইনি। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অনেকগুলো উদ্দেশ্যের ও আদর্শের কথা বলেছে। মূল বিষয়টি হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি যদি চালু থাকে তাহলে অন্তত আমাদের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের উত্তীর্ণ হওয়ার পর আরও তিন-চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমরা আশাবাদী যেহেতু আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এই নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করেছেন বলেই এই পদ্ধতি চালু করেছেন।

এই নয়া শিক্ষানীতিতে শিক্ষাগত মানের যোগ্যতা কী কমে যাবে?

U G C যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন , সেখানে তিন বছরের কোর্সের কোন জায়গা নেই ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার অটোনমি প্রয়োগ করে তিন বছরের কোর্স, চার বছরের কোর্সের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চালু করেছেন, আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ একটি কলেজ যে নিয়ম ইউনিভার্সিটিতে চালু করে তাতে প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নেই । ইউনিভার্সিটি যেভাবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে বলে আমাদের সেই ভাবেই কঠোর নিয়ম পালন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করাতে হয় । নতুন শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে যে, মাল্টিপল এক্সিট অর্থাৎ এক বছর পরে যদি কেউ ছেড়ে দিতে চায় তাহলে তাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। দু'বছর পড়ে গেলে তাকে ডিপ্লোমা কোর্স দিতে হবে, তিন বছর পড়লে তাকে একটা ডিগ্রী কোর্স দেওয়া হবে, যেটা জেনারেল ডিগ্রী কোর্সের সমতুল্য। চার বছরে কোর্সে দুটো আছে একটি অনার্স কোর্স এবং যারা রিসার্চ নিয়ে পড়বে তাদের অনার্স উইথ রিসার্চ । এটি হলো ইউজিসি নিয়ম অনুসারে পাঁচটা ক্যাটাগরি । তবে এই মাল্টিপল এক্সিট এই ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কী করবে তা আমার কোন ধারণা নেই। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন আমাকে ডাকা হয়েছিল এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য তখন আমি একটাই প্রশ্ন করেছিলাম, এক বছর, দুই বছর অথবা তিন বছর পর পড়ার পর যখন ছাত্র বা ছাত্রীকে যে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হচ্ছে সেই সার্টিফিকেটার মূল্য সে কি আদৌ কোথাও পাবে?

কারণ, যারা এই কোসটি প্রবর্তন করেছেন তাদের সকলেরই কিন্তু একটা নৈতিক দায়িত্ব যে ছাত্র-ছাত্রী এই কোর্সটি করবে তারা যেন পেশাগত জীবনে উপযুক্ত স্থান লাভ করতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অধিকারের জোরে এই তিন বছরের জেনারেল কোর্স চালু করেছে এই তিন বছরের কোর্স যেহেতু U G C শিক্ষানীতিতে কোথাও লেখা নেই তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ এলাকার বাইরে গিয়ে বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে এই তিন বছরের কোর্সের সত্যি কি তারা এই সার্টিফিকেটের মূল্য পাবে? বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী রাই তিন বছরের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করছে তাহলে তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আদৌ জায়গা করতে পারবে কী!

আপনার শিক্ষাগত জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন?

একবড় অংশ আমার জীবনে, ১৫ বছর আমি স্কুলে পড়িয়েছি, তারপর আমি ১৫ বছর কলেজে পড়েছি তারপরে এই কলেজে জয়েন করেছি। সুতরাং আমি তিনটি স্তরকেই দেখেছি স্কুল ও কলেজ এবং এখন একজন প্রশাসক হিসেবে কলেজকে দেখছি। মূল বিষয়টি হলো স্কুল জীবনের যে পড়াশোনা হয় সেই স্তরের সঙ্গে স্নাতকস্তরে কোনো সামঞ্জস্য এবং যোগসূত্র না থাকে তাহলে একটি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। যেমন স্নাতক স্তরের সঙ্গে স্নাতকোত্তর স্তরে সংযোগ থাকা প্রয়োজন। আমার মূল বক্তব্য হলো প্রত্যেকটা ছাত্র-ছাত্রী স্কুল কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন তার একটি দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, এবং নিজস্ব যে চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে তাতে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

আপনার শিক্ষাগত জীবনে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যদি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

এর আগে আমি সুরেন্দ্রনাথ উমেন্স কলেজে ছিলাম এবং সেখানে আমি ভূগোল বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম , সেই দায়িত্ব নেওয়ার সময় ছিল ভাঙ্গা বেঞ্চ, ভাঙা চেয়ার । সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযোগী শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিলাম, সেই ছাত্রীরা আজও আমাকে মনে রেখেছে এটাই আমার প্রাপ্তি।

বর্তমানে সংবাদের শিরোনামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং-এর ঘটনা উঠে আসছে সেই সম্পর্কে আপনার কী মত?

প্রথমত এটি হলো একটি বিকৃত মানসিকতার পরিচয়। কারোর মধ্যে যদি কোন সুপ্ত প্রতিহিংসা বোধ থাকে যেটা তার বড় হওয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, সেই প্রতিহিংসা বোধ কয়েকজনের সহযোগিতায় একজন নিরীহ ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা পশুর মত ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক পড়ুয়া যার মৃত্যুর ঘটনা আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা আরো দেখি এরকম হাজার হাজার পড়ুয়া বুকে এরকম যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে। যারা এই রাগিং এই মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত তাদের মৃত্যুদন্ড না দিয়ে সারা জীবনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় যাতে সারা ভারতবর্ষে একটি উদাহরণ হিসেবে সবার মনের মধ্যে থেকে যায়। একটা ছাত্র বা একটা ছাত্রী পড়াশোনার জন্য কোন ইনস্টিটিউটে আসে সে জীবনে বড় হওয়ার জন্য এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে আসে, তার বাবা-মায়ের স্বপ্ন সফল করার জন্য আসছে। সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যাতে এইরকম নরপিশাচদের হাতে না পড়ে তার কঠোর ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের উদ্দেশ্যে আপনি কী বার্তা দিতে চাইবেন?

এই সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগটি আরো বড় হোক । ভবিষ্যতে এই বিভাগে অনার্স আসুক এবং পি জি আসুক, আর তার থেকেও বড় কথা তোমরা সবাই প্রফেশনাল জার্নালিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হও, এটাই আমি চাই তোমরা জীবনে এগিয়ে যাও।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি সামনে দুর্গাপুজো, ছোটবেলায় দুর্গা পুজোর কিছু স্মৃতি যদি আমাদের জানান?

সত্যি কথা বলতে, আগে বাবা ছিল আমরা পুজোর সময় বাইরে বেড়াতে যেতাম। আমার বাবা সারা বছর ছুটি পেতেন না, বাবা সরকারি অত্যন্ত উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। সুতরাং, কলকাতার পুজোতে যে আমি খুব বেশি সময় কাটিয়েছি তা নয়, অন্যান্য জায়গাতেই চলে যেতাম।

আগের পুজো আর বর্তমান সময় পুজোর মধ্যে কী তফাৎ খুঁজে পান?

এখন দুর্গাপুজোতে অনেক উৎসব হচ্ছে, কার্নিভাল হচ্ছে। এখন আমাদের দুর্গা পুজোটা পর্যটন শিল্পের একটি অঙ্গ হয়ে গেছে, সেটা হয়তো আগে এইভাবে দেখা হতো না। এখন সেটা নতুনভাবে সরকারি উদ্যোগও রয়েছে। আগের পুজোর সাথে বর্তমান পুজোর এটাই তফাৎ।

এখন আপনার পুজোর ছুটি কেমন ভাবে কাটে?

এখন আমি কোন পূজা মন্ডপে বিশেষ যাই না বা যেতে পারি না। বাড়িতে আমার মা আর আমি, মা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি মাকে ছেড়ে কোন পূজা মন্ডপে যাই না। আমার মা-ই আমার কাছে দুর্গা ঠাকুর।' আমি মাকে নিয়েই এখন পূজা কাটাই।

অনুলিখন শ্রেয়া ঘোষ, শ্রেয়া মুখার্জি

মুখোমুখি কলেজ প্রেসিডেন্ট : শ্রী পার্থসারথি অধিকারি

নয়া শিক্ষা নীতি বিষয়ে আপনার কী মত?

নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে মত বলতে, জাতীয় শিক্ষা নীতি, যেটা কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছে, সেখানে চার বছর অর্থাৎ আটটি সেমিস্টার আছে, আগে আমাদের সময়ে দুই বছরে গ্রাজুয়েশন এবং তিন বছরে অনার্স কোর্স ছিল, বর্তমানে শিক্ষানীতিতে চার বছরের অনার্স কোর্স হলেও তিন বছরে গ্রাজুয়েশন করে কুইট করতে পারে। কেন্দ্র সরকার এই শিক্ষা নীতি করেছেন। প্রত্যেকটি রাজ্য মানছে, আমদের রাজ্যেও ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। সেমিস্টার সিস্টেমে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আরো ভালো করে তৈরি করতে পারবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, এক্সপার্টরা ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সকলে মানছে ভবিষ্যতেও মেনে চলতে হবে।

পুজো নিয়ে আপনার কী অভিজ্ঞতা?

আসলে দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, এই পূজো শুধু বাঙালির নয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন সকল ধর্মের সমন্বয় ঘটানো ,"ধর্ম যার যার উৎসব সবার"। পূজোটা আমাদেরও খুব ভালো লাগে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের দেখে আমরাও খুব নস্টলাজিক হয়ে যাই । আমাদের ওই সময়কার বাবা মা এর হাত ধরে প্যান্ডেল পরিক্রমা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার স্মৃতি মনে পরে যায়, এর পাশাপাশি আমি একটি সংস্থার পক্ষ থেকে পূজো পরিক্রমা করতে বেরতাম এই সব অভিজ্ঞতাই খুব ভালো লাগে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020: সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ডঃ মন্টু বিশ্বাস, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, Head (acting) Department of Journalism and Mass Communication

মানব মনের পরিশীলন, পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই মানসপরিশীলনজাত ফসলের সাহায্যেই মানবজাতি প্রতিনিয়ত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তাই জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখার যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞান , প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা করার জন্য দক্ষ মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুণগত উচ্চমানের শিক্ষাই এই চাহিদা পূরণ করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সর্বাঙ্গিক শিক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একবিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখানে একদিকে যেমন স্থায়ী উন্নয়ন বা Sustainable Development এর লক্ষ্যমাত্রা [Goal No.-4 Ensure inclusive and equitable equality education and promote lifelong learning opportunities for all.] পূরণের কথা কথা ভাবা হয়েছে , তেমনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত তথা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলার আদর্শের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যোগসূত্র স্থাপনের দিকটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । শিক্ষায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষার স্তর পর্যন্ত সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতির দিকনির্দেশ রয়েছে এই শিক্ষা নীতিতে। শুধু তাই নয়, কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে, বৃত্তিমূলক ও পাঠ্যশাখাগুলির মধ্যে পার্থক্য দূর করা প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। বিদ্যার্চচার পাশাপাশি নৈতিকতা মানবিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের দিকগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মূল্যবোধের দ্বারা বিকশিত উচ্চ গুণগত শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ঘটিয়ে তাকে প্রকৃতরূপে একজন বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার সংগত নির্দেশিকা হলো জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০।

টিম দৃষ্টিকোণ

সম্পাদক : সম্প্রক্তা বাগচী ও সমতা চক্রবর্তী (Visiting Faculty)

সহসম্পাদক : সুদিপ্তা কোলে, ও মৌপিয়া সরকার (5th SEMESTER)

পৃষ্ঠাসজ্জা : সমতা চক্রবর্তী

কারিগরি সহযোগিতা : রাহুল সাহা (5th SEMESTER)

চিত্রবিভাগ : আশিস রায় (5th SEMESTER)

বিশেষ সহযোগিতা : বিদিপ্তা স্যানাল (3rd SEMESTER), মনীষ প্রামানিক(5th SEMESTER), রাহুল সিং(বিভাগীয় সহায়ক)

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

মাননীয় অধ্যক্ষ ড. কৌস্তভ লাহিড়ী, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া

ডঃ মন্টু বিশ্বাস, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, Head (acting) Department of Journalism and Mass Communication, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া

ও যারা সাক্ষাৎকারদানের মাধ্যমে এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন

হাওড়া-আমতা ঐতিহাসিক যোগাযোগ মাধ্যম: মার্টিন রেল

মনে পরে, সুপারহিট 'ধন্যি মেয়ে' ছবিটিতে 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল' গানটির কথা! আর গানটিতে দেখানো সেই ট্রেনটা! কলকাতা ছাড়লেই দামোদরের পূর্বতীরে ছবির মতো জনপদ আমতা। হাওড়া জেলা জুড়ে যে বিশাল গ্রামীণ এলাকা রয়েছে তার মধ্যে ইংরেজদের সময় থেকেই একমাত্র আমতাকে শহর বলে গণ্য করা হত। শহর গড়ে ওঠার যেদুটি প্রধান শর্ত থাকে অর্থাৎ রেলপথ আর জলপথ যোগাযোগের যুগলবন্দি একমাত্র আমতাতেই ছিল।

১৮৯৮ সালে হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত চালু হলো মার্টিন ট্রেন। ১৮৯২ সালে মার্টিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়, তার ঠিক ছয় বছর পড়ে এই মার্টিন ট্রেনের উদ্বোধন হয়। ছোট লাইনের এই ট্রেনই তখন আমতা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের পরিবহনের একমাত্র সহায়। আজকের মতো বাস,টোটো ,আটো কিছুই ছিলনা তখন, কয়লায় চলতো এই ট্রেন। ছোট্ট ইঞ্জিন সাত আটটা ছোট কামরা নিয়ে দুলকি চালে রওনা দিত এই মার্টিন ট্রেন। হাওড়া-হুগলির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষের কাছে আপনজন ছিল এই রেলগাড়ি।

কোন স্টেশনেই প্ল্যাটফর্ম নেই মাটি থেকে খুব সহজেই তিন ধাপ পাদানী পেরিয়েই উঠে পরা যেত কামরার ভেতরে। কারো বাড়ির উঠোন, কারো বাড়ির বাগানের ভিতর দিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যেত সে। শুধু 'ধন্যি মেয়ে নয়, এই ট্রেনের সাথে বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়, যেমন ১৯৬৯ সালে দীনেন গুপ্ত পরিচালিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'নতুন পাতা' সিনেমায় নায়িকা এই মার্টিন রেলওয়ের অন্তর্গত পাঁতিহাল স্টেশনে স্টেশনমাস্টারের ঘরের ছাদে উঠে বাঁদর ধরার কসরত করেছিল, ১৯৬৬ সালে গুরু দত্তের ছবি 'বাহারে ফির ভাই আয়েগি'-তে ধর্মেন্দ্র ও জনি ওয়াকারের অভিনয়ে এবং মহেন্দ্র কপূরের কণ্ঠে 'বাদল যায়ে অগর মালি, চমন হোতা নহি মালি' গানটি দৃশ্যায়িত হয়েছে।

শুধু চলচ্চিত্র নয় বাংলা সাহিত্যেও এই রেলগাড়ির কথা পাওয়া যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর 'হাওড়া-আমতা ট্রেন দুর্ঘটনা' নামক উপন্যাস, কবি বিষ্ণু দে-র লেখা 'ছড়ানো এই জীবন', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযাত্রিক'-এ মার্টিন রেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাশনগর যে শেফিল্ড আখ্যা পেয়েছিল তার প্রধান কারণ হলো এই মার্টিন ট্রেন । এখন যেখানে হাওড়ার বিডিও অফিস গ্রামীণ প্রকল্পের কেন্দ্র ও কোণা বাজার এলাকা, তা ছিল মার্টিন রেলের স্টেশনের এলাকা।

ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি ছিল প্রবল, তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্যের হাওড়াকে হাওড়া-হুগলির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাথে জুড়ে দিতে, তার মাধ্যমে ছড়িয়ে যাবে গ্রামীণ এবং কুটির শিল্প যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি হবে মজবুত। আমতা সংলগ্ন অঞ্চলের কাঁসা-পিতল , মাদুর, পাট, লোহার পেরেক, মাটির জিনিস এইসব এর চাহিদা তখন তুঙ্গে , সেই জিনিস গুলো বৃহত্তর বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মার্টিন ট্রেনের সূচনা।

কিন্তু মাত্র ৭২ বছরেই এই স্বপ্নের পরিবহনের ইতি ঘটে । আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে কুটির শিল্পের বাজারে ভাটা পরতে শুরু করলে। মানুষ নিশ্চিত জীবনের আশায় কুটির শিল্প থেকে মুখ ফেরালো। তারপর হাওড়া-আমতা সড়ক পথ তৈরী হওয়াতে মার্টিন ট্রেনের গুরুত্ব আরও কমতে থাকে । দুলকি চালে মার্টিন ট্রেনে চেপে গন্তব্যে পৌঁছতেও সময় লাগত অনেক। টিকিট না কেটেই অনেকেই উঠে পড়ত ট্রেনে, যার ফলে লোকসানে পরে মার্টিন কোম্পানি । সরকারের তরফ থেকেও কোনো রকম আগ্রহ দেখা গেলো না, এই ঐতিহাসিক ট্রেনকে চালিয়ে যাওয়ার। তাই বাধ্য হয়ে কালের নিয়মে ১৯৭১ সালে স্তব্ধ হয়ে যায় এই ট্রেনের গতি।

মৌপিয়া সরকার

ছবি : গুগল

গণমাধ্যম ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স: সুযোগ বনাম চ্যালেঞ্জ

ইতিহাস সাক্ষী আছে মানুষ যেমন প্রযুক্তি নির্মাণ করে, সেই একইসঙ্গে সে প্রযুক্তিকে ভয়ও পায়। ভারতে কম্পিউটার আসার আগের সময় মানুষেরা হাতে-কলমে সকল কাজ করতো। কম্পিউটার আসার পরে মানুষের মনে একপ্রকার ভয় তৈরি হয়। যদি এই কম্পিউটার তাদের চাকরিতে তাদের জায়গা নিয়ে নেয়! কিন্তু বর্তমানে মানুষ কম্পিউটারের সঙ্গে চলতে শিখেছে। কম্পিউটার কে নিয়েই তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকারের নতুন রোজগারের পথ খুঁজেছে। আবারও তেমনি একটি ভয় তৈরি হয়েছে মানুষের মনে। সত্যি কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষকে ছাপিয়ে যাবে! আমরা ছোটবেলায় টার্মিনেটর এজ অব আলট্রন সো এর বিভিন্ন সিনেমা দেখেছি, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের থেকে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে মানুষের জায়গায় প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। তবে কি সেটাই হতে চলেছে এইবারেও?

এই বিষয়টি জানতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI কী? আর্টিফিসিএল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন বিভিন্ন নিউরন থাকে, যেখানে তার স্মৃতি বা তার অভ্যেস বা তার জানা জিনিসগুলো সঞ্চিত হয়ে যা জীবনের গতিপথে সাহায্য করে। সেই রকমই অনেক ডেটাপয়েন্ট অর্থাৎ তিন ট্রিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট একসঙ্গে যুক্ত করে, সাইন্টিস্টরা এবং ইঞ্জিনিয়াররা অনেক পরিমানে ডেটা ইনপুট করে তৈরি করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মূলত দুই প্রকার: ১)আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ২) আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স। সরলভাবে বলতে গেলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হলো একটি সাধারণ মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিন্তাশীলতা। আর সুপারেন্টেলিজেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কে আমরা পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান মানুষ আলবার্ট আইনস্টাইনের সমতুল্য ধরতে পারি। যেখানে আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট, তাকে যেটা আদেশ দেয়া হয় সেইটুকু কাজ করে থাকে, সেখানে আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্ট সেই জিনিসগুলির থেকে আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজে থেকে থিওরি গঠন করতে পারে, নিজে থেকে নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারে।

বর্তমানে গণমাধ্যম এবং বিশেষত সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিভাগগুলিতেও এই AI-এ ব্যবহার শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে, পিছিয়ে নেই ভারত। বর্তমানে ভারত সহ বিভিন্ন দেশ নিজস্ব এআই নিউজ অ্যাঙ্কার প্রকাশ করেছে যেমন ভারতের ওড়িশায় এক বেসরকারি চ্যানেল আনল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি সংবাদপাঠিকা বা সঞ্চালিকাকে। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে লিজা। ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী হাতে বোনা শাড়ির সঙ্গে ছিমছাম সাজে ঝরঝরে ইংরেজিতে সংবাদপাঠ করেন তিনি। ওড়িয়া ভাষাতেও সংবাদপাঠ করেন এআই কৌশলে তৈরি এই অ-মানবী সঞ্চালিকা। বর্তমানে শুধু হিন্দি, ইংরেজিতে বললেও

লিজা একাধিক ভাষায় পারদর্শী। তাঁর আগমনে ওড়িশা গণমাধ্যম তথা সংবাদ-মাধ্যমে নতুন মাইলফলক স্থাপিত হল বলে মনে করা হচ্ছে। একই পথে হেঁটে প্রকাশ্যে এসেছে "Aj tak" নিউজ চ্যানেলের সানা নামক এ আই নিউজ অ্যাঙ্কার।

এবার জেনে নেওয়া যাক, মিডিয়া হাউজ-গুলোর এআই সংবাদ উপস্থাক হলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে-

ক্রমাগত সংবাদ কভারেজ

এআই সংবাদপাঠকরা মানুষের মতো ক্লান্তি বা শিডিউল জটিলতা ছাড়াই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সংবাদপাঠ করতে পারে। এটি সার্বক্ষণিক কভারেজ এবং দর্শকদের কাছে তথ্যের সময়মতো প্রচার নিশ্চিত করে।

ভাষাগত দক্ষতা

এআই সংবাদপাঠকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক একাধিক ভাষায় সংবাদ প্রচার সম্ভব। ফলে কার্যকরভাবে এটি বিস্তৃত শ্রোতা শ্রেণির কাছে পৌঁছাতে এবং সামগ্রিক প্রচারণায় সাহায্য করে।

ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা

এআই সংবাদপাঠকরা পূর্বনির্ধারিত শৈলী ও মানদণ্ড মেনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ সরবরাহ করতে পারে। এটি মানবিক ত্রুটির (হিউম্যান এরর) আশঙ্কা কমায় এবং দর্শকদের কাছে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিং

এআই সংবাদপাঠকদের রিয়েল-টাইমে প্রচুর পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা রয়েছে, যা দ্রুত বিশ্লেষণ ও জটিল তথ্য উপস্থাপনে সক্ষম। যেমন- লাইভ নির্বাচনের ফলাফল, আর্থিক আপডেট বা খেলাধুলার স্কোর সম্প্রচার।

অসুবিধাও কিছু রয়েছে

মানবিক উপাদানের অভাব

এআই সংবাদপাঠ সম্পর্কিত প্রাথমিক উদ্বেগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো —মানুষের আবেগ, অন্তর্দৃষ্টি ও সমালোচনামূলক চিন্তা করার ক্ষমতার অনুপস্থিতি। সাংবাদিকরা প্রায়ই তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসঙ্গ এবং বিচার সংবাদ প্রতিবেদনে নিয়ে আসেন, যা এআই'র ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

নৈতিক বিবেচনা

স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের বিষয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে এআই সংবাদপাঠকরা। শ্রোতাদের জানার অধিকার রয়েছে, তারা কোনো মানুষের সংযুক্ত হচ্ছেন নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। এক্ষেত্রে আস্থা ও নৈতিকতার মান বজায় রাখতে স্পষ্ট যোগাযোগ এবং স্বচ্ছতা অপরিহার্য।

বিশ্বাসযোগ্যতা ও পক্ষপাত

এআই সংবাদপাঠকরা অ্যালগরিদম ও প্রি-প্রোগ্রামড ডেটার ওপর নির্ভরশীল। এটি পক্ষপাত বা ভুল তথ্য সম্পর্কিত উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। নির্ভুলতা, ন্যায্যতা এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন নিশ্চিত করা এআই সিস্টেমের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা

মানবিক আচরণ, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝা বা অলিখিত পরিস্থিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে এআই সংবাদপাঠকরা। অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা ব্রেকিং নিউজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এআই সিস্টেমের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

আশিস রায়

ছবি : গুগল

আগমনী

পুজোর নস্টালজিয়া

প্রতিবেদন : সুদিপ্তা, আশিস, মৌপিয়া

শেক সাদ্দাম হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

""আমার যেহেতু গ্রামে বাড়ি তো সেখানে দেখেছি, আগে গ্রামের মানুষ নিজেদের এলাকার মধ্যে থাকতো এত মানুষ কলকাতা মুখী ছিল না, হয়তো সেটা কম্যুনিকেশান উন্নত না হওয়ার কারণে হতে পারে। এখনো মানুষের পুজো মানে শপিং মল থেকে যাওয়া শুরু করে কলকাতা মুখী হওয়ার প্রবনতা বেড়েছে।"

শিল্পা দত্ত (ফিজিওলজি বিভাগ)

"আগে বন্ধু বান্ধবীদের সাথে ঠাকুর দেখতে যেতাম, তারপর কয়েকবছর করোনার জন্য সেভাবে ঠাকুর দেখা হয়নি আর এখনো একটা ভয় থাকে অত ভিড়ের মধ্যে যাব কী হবে না হবে তাই সেভাবে ভিড়ের মধ্যে না যাওয়া টা পছন্দ করি , বাড়ির পাশে প্যান্ডেল বসে বাড়ির সবার সাথে সময় কাটাই, আর ছোটো বেলায় মা বাবার সাথে কাছে প্যান্ডেলের ঠাকুর দেখতাম"।

সন্তু পরিয়া (জুওলজি বিভাগ)

"আগে আমরা পূজোয় ঠাকুর বলতে বুঝতাম, মাটির ঠাকুর হবে, তাতে রং হবে, ঠাকুরের যে সাজ পোষাক সেটা থাকবে, কিন্তু বর্তমানে এত বেশি থিম অ্যাক্ট্রাকটিভ হয়ে পড়েছি, ঠাকুরের যে আসল রূপ টা সেটা থেকে আমার মনে হয় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। পূজোয় যে আসল দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যে কনসেপ্ট হয় তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি"।

মৌসুমি দাস (পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগ)

আগে পূজো মানে ছিল পাড়ার প্যান্ডেলে, আর বিশেষত পরিবারের সাথে সময় কাটানো, আমরা ছোটো বেলায় এত বন্ধু বান্ধবদের সাথে ঘুরতাম না, এখনের জেনারেশন বন্ধু বান্ধবদের সাথে শপিং মলে বেশি ঘুরতে পছন্দ করে। এটাই তফাৎ আমাদের ছোটো বেলার সাথে এই জেনারেশনের ছোটোদের"।

অসীম কুমার রায়. (বানিজ্য বিভাগ)

" আমাদের সময়ে পূজো আবেগজনিত ছিল এখনো আবেগ জনিত রয়েছে, তবে আমাদের কাছে পূজো মানে ছিল একটু আনন্দ, শ্রদ্ধা ভাব আবার ধর্মীয় আচরণ, মঙ্গল কামনার জন্য, কিন্তু এখন তথাকথিত সমাজে পূজো মানে একটা ভালো কিছু কিনবো, পাব, কি পেলাম না এই ব্যাপারের দিকে চলে গেছে" ।

সোনা রুপা, সাত সমুদ্রের জল, চন্দন কাঠ নিয়ে শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ

হাতে সময় আর নেই বললেই চলে। মহালয়ার আর মাস খানেকের অপেক্ষা। কোথাও পড়ছে খড়ের উপর মাটির প্রলেপ। কোথাও আবার রঙের কাজ শেষ হয়ে গিয়ে চলছে তুলির ফাইনাল টাচ্। কুমারটুলির আঁকে বাঁকে এখন উঁকি দিলেই অপলক দেবী দুর্গাসহ পরিবারবর্গ।

ডক্টর. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের 'সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন' বিভাগের ছাত্রছাত্রী- শ্রেয়া মুখার্জী,শ্রেয়া ঘোষ ও মনিশ প্রামাণিক গিয়েছিলাম শারদীয়া উৎসবের পূর্ববর্তী চিত্র ও তথ্য সংগ্রহ করতে। সেখানে গিয়ে আলাপ হল কুমোর পাড়ার এক বয়সজ্যেষ্ঠ শিল্পী 'কালীচরণ পাল' এঁর সাথে।

কথায় কথায় উঠে এল ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি যুক্ত এই শিল্পের সাথে।

তিনি জানালেন, ইদানিং কালে শুধুমাত্র বাংলা বা ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বে রপ্তানি হয় কুমারটুলির প্রতিমা। যেমন, মালয়েশিয়া, ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশে এছাড়াও আমেরিকা যাওয়ার কথা হচ্ছে তবে তা দেবী দুর্গা নন ভগবান বিষ্ণু।

এক সময় মাটি ছাড়া এখানে কোন কাজ হতো না। দু একটা নামজাদা ঘরে তারাই পাথরে, সিমেন্টের, পেপার প্লাপ, প্লাস্টারের কাজ জানতো এবং তারাই শুরু করলো। আস্তে আস্তে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কাজের নতুনত্বের প্রবেশ ঘটলো।

মহামারির সময় আমাদের জীর্ণদশা হয়ে গিয়েছিল সবকিছু বন্ধ থাকায়, সমস্ত কর্মচারী তাদের বাড়ি চলে যাওয়ায় কোন প্রতিমা তৈরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রতিমা ক্রয় করার ক্রেতাও তেমন ছিলেন না। ফলে আয়ের কোনও রাস্তা দেখতে পাইনি।

কবে থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় এখানে?
এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, প্রতিমার পরিসংখ্যা বেশি হলে তাহলে আমরা মার্চ-এপ্রিল থেকে কাঠামো তৈরি শুরু করি। রথের দিন থেকে অর্ডার আসা শুরু হলে ব্যস্ততা বেড়ে যায়।

তিনি আরও বলে চললেন, এই কাঠামো তৈরির বাঁশ যারা নিয়ে আসে তাদের বলা হয় 'গাড়োয়ান'। তারা আমাদের বুঝিয়ে দিত কোন বাঁশ ভালো আর কোন বাঁশ খারাপ। তবে বাসের কাঠামো ছাড়াও আমরা গরান কাঠ দিয়েও কাঠামো তৈরি করতাম। এই গরান কাঠ অত্যাধিক না থাকায় প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, একটু হলেও মায়ের প্রতিমা তৈরির কাঠামোর সাথে বেঁধে দিতে হয়। এছাড়াও ভিন্ন লোকের নিয়ম অনুসারে কেউ সোনা রুপা, কেউ সাত সমুদ্রের জল, অথবা চন্দন কাঠ নিয়ে এলে তা কাঠামো সাথে বেঁধে প্রতিমা তৈরি কাজ শুরু হয়।

কি কি রংয়ের মায়ের বর্ণ হয়?

বর্ণের রং এর বিভিন্নতা বহুপ্রকার যেমন হলুদ, সূর্যের রঙ, কমলা, লাল, শ্যাওলা,শ্যামা রং প্রভৃতি। মা শৈবাল শ্যাওলা রূপ ধরেছিলেন তাই তার রূপ শ্যাওলা। গ্রীষ্মের রূপ ধরেছিলেন মা তা এখনো অনেক বাড়িতে পূজিত হয় 'নবদল দুর্গা শ্যাম'। কেউ মায়ের মুখ শ্যামা রঙ করেন, এবং হাত হলুদ রঙের করেন। এছাড়াও যাদের যা নিয়ম তাই অনুসারে কাজ হয়।

একটি ঠাকুর সম্পূর্ণ করতে কতদিন সময় লাগে?

একটা ঠাকুর করতে একমাসও লেগে যায় আবার ১০ দিনেও হয়ে যায়। অর্থাৎ ৩০টি ঠাকুর করতে সময় লেগে যায় প্রায় ৩০০ দিন। মার্চ থেকে শুরু করলে তবেই অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা যায়। প্রবাসী কর্মচারী ছাড়া বিভিন্ন কর্মচারীরা নিজেদের প্রয়োজনে বাড়ি চলে গেলে কাজ এগোতে পারে না তাই আগে থেকেই কাজ শুরু করতে হয়।

এই শিল্পতে নয়া শিল্পীদের কী আগ্রহ দেখতে পাচ্ছেন ?

এই কাজ থেকে আমাদের ছেলেরা সরে যাচ্ছে। একটু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তারা বিভিন্ন চাকরির সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

নিজস্ব চিত্র

আমাদের পুজো ওদের পুজো

দুর্গাপুজো নামটা শুনলেই খুশিতে মেতে ওঠে আট থেকে আশি। বাঙালির কাছে এযেন এক চিরকালীন উন্মাদনা। পুজো আসছে শুনলেই আমাদের মাথায় ভিড় করে আসে হাজার রকমের
পরিকল্পনা। পুজোর চারটি দিনকে আরও রঙ্গিন করে তুলতে পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই আমরা ভিড় জমাই নামিদামি শপিংমলে। নিজেকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে আমরা বেছে নিয়ে সেরার সেরা জিনিসটাকে। প্রিয়জনকে দেওয়া উপহারই হোক বা নিজের জন্য পছন্দের জিনিসের জন্য সাধারণত আমরা কার্পণ্য করি না। কিন্তু এহেন পুজোরও আছে বিভিন্ন রকমের দিক। উচ্চবিত্ত তথা তুলনামূলক আর্থিক দিকে সচ্ছল যারা তাদের পুজো শুরু হয় পুজোর আগে থেকে। বন্ধুত্ব হইহল্লা খাওয়া-দাওয়া ঐতিহ্যের পুজোর সাথে মিলবন্ধন ঘটে আধুনিকতা।

কিন্তু এত গেল উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের গল্প। প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মত এই আলোর উৎসবে সামিল হতে পারে না আমাদের সমাজেরই একটি অংশ। পুজো এলেই আমরা মেতে উঠি নানারকম তথাকথিত সমাজসেবা মূলক কর্মসূচিতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শিশুদের বা বয়স্ক মহিলাদের একটি পোশাক আর সামান্য কিছু খাদ্য দিয়ে মনে করি আমরা বুঝি তাদের দুর্দশা মোচন করলাম। কিন্তু আদৌ কী তা হয়? একটা নতুন পোশাক কী একজনের মুখে হাসি ফোটাতে পারে? যেখানে পুজোর চার দিন সে পেটভরা খাবার পাবে কিনা তারই নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিছু কিছু মানুষের বিক্রি বাট্টা বা দোকানদারি বন্ধ থাকে এই সময়। আলোর উৎসবে সামিল হওয়া তাদের পক্ষে কতটা কঠিন আমরা সেটা দেখতে চাই না বা বলা ভালো আমরা ভাবতেও চাইনা। কারণ আমরা ভাবতে থাকি শুধুমাত্র নিজেদের আনন্দ নিয়ে। যে শিশুগুলোর প্রতিদিন দুবেলা অন্ন মুখে জোটে না, রাস্তার পাশের বিরিয়ানির গন্ধ তাদের পক্ষে সত্যিই বেদনাদায়ক। পেটে খিদে নিয়ে কখনোই কী সম্ভব উৎসবে সামিল হওয়া! কিন্তু মানুষে মানুষে এত বিভিন্নতা কেন? এ সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্রই আগ্রহী নই । যেখানে আমরা ঠিক করে রাখি পুজোর চার দিন কোন কোন রেস্তোরাঁয় পেট পুজো সারবো কিংবা আফসোস করি কোন 'ডিশ'টা ট্রাই করা হলো না বলে। সেক্ষেত্রে সেই দরিদ্র শিশুর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ যেন সত্যিই ঝলসানো রুটি।

অনাহার দারিদ্রতা যাদের নিত্য সঙ্গী, রোগব্যাধির সঙ্গে যাদের ঘর, তাদের পক্ষে আনন্দের আলাদা কোনও সংজ্ঞা থাকতে পারে কী! ভালো থাকা বা স্বাভাবিক জীবন যাপন করা কাকে বলে তাদের কাছে অধরা। কর্তব্য বা মানবতার খাতিরে পুজো আসছে বলে আমরা যতই একটা পোশাক দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাই না কেন সেখানে আমাদের সমাজে এক অংশ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের মুখে হাসি ফোটানো কোনও প্রয়োজনীয় উচিত ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের কী উচিত নয়! প্রশ্ন উঠছে, প্রশ্ন থাকবে আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে।

প্রতিবেদনঃ শ্রেয়া (5th SEMESTER)
ছবি সৌজন্যঃ গুগল

এবার পুজোর সিনে-হপিং

সিনেমা	অভিনয়	আকর্ষণ
নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর রক্তবীজ	আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুসূয়া মজুমদার, কাঞ্চন মল্লিক, সত্যম ভট্টাচার্য, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, দেবাশীষ ভট্টাচার্য প্রমুখ।	বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনা সব সময়ই এই পরিচালক জুটিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চারপাশের ঘটনা থেকেই গল্পের রসদ খুঁজে নিতে জানেন। এ বারেও তার অন্যথা হচ্ছে না। প্রথম বার পুজোয় আসতে চলেছে তাঁদের ছবি। ২০১৪ সালে ২ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। কেন ঘটেছিল এই ঘটনা? তা কেন্দ্র করেই আসছে তাঁদের নতুন ছবি 'রক্তবীজ'। সাধারণত গরমের ছুটি অথবা শীতের ছুটি সময় এই পরিচালক জুটি নিজের সিনেমা প্রকাশ করে। কিন্তু পুজোর সময় এই লড়াইতে তারা কখনোই নামেনি কিন্তু এইবারে এই চলচ্চিত্রটি সঙ্গে এক গভীর যোগ রয়েছে দুর্গাপুজোর তাই জন্যই তাদের এইবারে দুর্গা পূজার লড়াইতে নাম লেখানো। এটি সিনেমায় মুক্তি পেতে চলেছে ২০ অক্টোবর
পরিচালকঅরুণ রায়-এর বাঘা যতীন	মুখ্য চরিত্রে এখানে দেখা যাবে দীপক অধিকারী তথা দেবকে, বাঘা যতীনের স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাবে আরেকটি নতুন মুখ সৃজিতা দত্তকে, বাঘাযতীনের বোনের চরিত্র দেখা যাবে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে এছাড়াও আরো অন্যান্য চরিত্রকে দেখা যাবে।	হীরালাল, ৮/১২ এর মতো আরেকটি আসল ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে গড়ে তোলা আরেকটি অ্যাকশন সিনেমা হল বাঘাযতীন। দেব এন্টারটেইনমেন্ট এর প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ হচ্ছে। বাঘা যতীনের জীবনযাত্রা এবং দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে নিয়ে এই সিনেমাটি গড়ে উঠতে চলেছে এই সিনেমাটিও মুক্তি পেতে চলেছে ২০ অক্টোবর।
অরিন্দম শীল-এর জঙ্গলে মিতিন মাসি	ফের মিতিন মাসি রূপে কোয়েল আসছেন বড়পর্দায়।	বাঙালির গোয়েন্দা চরিত্রের অন্যতম হলো সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা মিতিন মাসি চরিত্রটি। এটি মিতিন মাসি ফ্রানচাইজির দ্বিতীয় সিনেমা। এই গল্পটি মিতিন মাসি যখন তার পরিবারকে নিয়ে সারান্দার জঙ্গলে ঘুরতে যায় তখন তারা এক হাতি পাচার চক্রের হদিশ পায় এবং তাই নিয়ে এই গল্পটি আবর্তিত। শুভ মুক্তি ২০শে অক্টোবরে।
সৃজিত মুখার্জি-এর দশম অবতার -	মুখ্য চরিত্রে আমরা এখানে দেখতে পাব প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যিশু সেনগুপ্ত, জয়া এহসান।	বাইশে শ্রাবণ'-এর প্রবীর রায়চৌধুরী এবং 'ভিক্ষি দা'-র ডিসিডিডি পোদ্দার একসঙ্গে রহস্য উদঘাটন করবেন নতুন ছবিতে। এই থ্রিলার ছবিটি দিয়েই টলিউডে ফিরছেন সৃজিত। শুভ মুক্তি ২০ শে অক্টোবর।

প্রতিবেদনঃ আশিস (5th SEMESTER)

হাওড়ার ভুরিভোজের ঠিকানা

পুজো মানে হইচই , আর সাথে পেট পুজো , ওই চার-পাঁচ দিন ধরে প্যান্ডেল হপিং এর পাশাপাশি পেট পুজো না করলে হয় ! আর এই দিন গুলিতে বাড়ির সাথে সাথে রাস্তার ধারে দোকান গুলিতে চলে ভরপেট পেটপুজো লিস্টে থাকে চাউমিন, এগরোল, মোমো, আরও কত রকমারি খাবার। হাওড়া যেহেতু কলকাতার যমজ শহর তাই কলকাতার পাশাপাশি হাওড়াতেও প্যান্ডেল হপিং এর ঢল নামে। তাই বাঙালির সবথেকে বড় উৎসবের সবথেকে সুস্বাদু খাবার এই হাওড়ার বুকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে রইল এমন কিছু সুস্বাদু স্ট্রিট ফুডের সন্ধান-

কচির এগ রোল - বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাদ্য হলো এগ রোল অথবা চিকেন রোল। মধ্য হাওড়ার ইচ্ছাপুরে হাওড়ার সব থেকে বড় আকারে রোল পাওয়া যায়। যা হচ্ছে কচির এগ রোল।

চানা বাটোরা- পুজোর সময় অনেকেই নিরামিষ খাবার খোঁজেন, রামরাজাতলা সাঁতরাগাছি মোড়ের ঠিক আগে রয়েছে অত্যন্ত সুস্বাদু নিরামিষ চানা বাটরার দোকান। সেখানে যেমন স্বাদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া নেই তেমনি স্বাস্থ্যের সঙ্গেও কোন বোঝাপড়া নেই।

শিবার মোমো – মধ্য হাওড়ায় আড্ডা দেওয়ার জন্য জনপ্রিয় জায়গা ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে এই মোমোর দোকানটি অবস্থিত যেখানে প্রায় ১০ রকমের মোমো সহ আরো নানা রকমের ফ্রাইড আইটেমও আছে এখানের প্যান ফ্রায়েড মোমোটি আপনারা সকলেই ট্রাই করতে পারেন।

বেদুইন - হাওড়ার পার্বতী সিনেমা হল থেকে কিছুটা এগিয়ে এই দোকানটি অন্যতম মোমো ডেসটিনেশন। সাথে এখানকার রেশমি কাবাব, হারিয়ালি কাবাব সহ বিভিন্ন কাবাব আইটেম আপনার মুখে জল এনে দেবে। তাই পুজোর প্যান্ডেল হপিংয়ের পরিশ্রমের পর নিজের পেটের খিদেকে এখানে শান্ত করতেই পারেন।

বিরিয়ানির সমাহার - বাঙালির পুজো মানে এক প্লেট বিরিয়ানি তো থাকতেই হবে তা হাওড়ার মধ্যে সেরা বিরিয়ানির সন্ধান পাবেন না তা কী কখনো হয়? হাওড়ার সর্বোচ্চ প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি হল রামতলার আশীর্বাদ বিরিয়ানি।পাশাপাশি আরও কিছু বিরিয়ানির দোকান আপনারা অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন যেমন পার্বতী থেকে এগিয়ে রাহাত নামের এক বিরিয়ানির দোকান যার খদ্দেররা নাকি দাসনগর টিকিয়াপাড়া থেকেও তাদের কাছে বিরিয়ানি নিতে আসে এটা তাদেরই দাবি। এছাড়াও ক্যারিরোড এর ধারে মোঘল এম্পরিয়াম, কদমতলায় এসে গেছে জনপ্রিয় আরসেলান যদিও তা আসল আরসালানের শাখা নয়।

স্ট্রিট ফুডের বাইরে গিয়েও বর্তমান হাওড়ায় কিছু রেস্তোরাঁ খুবই সুস্বাদু খাদ্যের পরিবেশনের মাধ্যমেও মানুষের মন জয় করে নিচ্ছে-
থালিবান- হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে এক ছোট্ট রেস্টুরেন্ট হল থালিবান কম খরচাতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাদ্য এবং কম্বের সমাহার এখানে পাওয়া যায়। এখানে ১৩৯ টাকায় নিরামিষ কম্ব এবং ১৫৯টাকায় আমিষ কম্ব পাওয়া যায়। তাছাড়াও নানা রোলকম্বো এবং মোমো কম্বো এখানে পাওয়া যায়।

বং চাউ – তার ঠিক পাশেই রয়েছে এই আউটলেটটি। খুব কম দামের সঙ্গে সুস্বাদু চাইনিজ খাবার পরিবেশন করেন, পরিবেশ , খাবারের মান ও পরিমান আপনার মন কেড়ে নেবে, হাওড়ায় এলে অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন। এদের অপর শাখা রয়েছে কদমতলায়।

দাওয়াতী রিয়াজ - প্রিমিয়াম ভাবে সাজানো এই রেস্টুরেন্টটির দামটা কিন্তু মোটেই প্রিমিয়াম নয় মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই। সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ করতে হলে, একটি প্রিমিয়াম এক্সপেরিয়েন্স যদি আপনারা পেতে চান অবশ্যই এখানে আসতে পারেন।

খিদে- কলকাতায় ঠাকুর দেখে যখন বাস ঢুকবে হাওড়া ময়দান, আর আপনার খিদে পাবে তখন অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে আসবেন খিদেতে। এটি একটি ছোট্ট রেস্টুরেন্ট যেখানে খুবই অল্প দামে খুবই সুস্বাদু খাদ্য পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনঃ আশিস (5th SEMESTER)
ছবি সৌজন্যঃ গুগল

এবারে পুজোর আনন্দে মেতে উঠুক ওরাও : উদ্যোগে DREAM NOTE

দুর্গাপুজো মানে একরাশ আনন্দ, নতুন জামার গন্ধ, বড় বড় রেস্তোরাঁ বা রাস্তার পাশে স্টল গুলিতে দাঁড়িয়ে পেটপুজো । এই পুজোর দিন গুলিতে সবথেকে বেশি আনন্দিত হয় বাড়ির খুদে কচিকাচারা, কারণ তাদের কাছে পুজো মানেই পড়া থেকে বিরতি নিয়ে নতুন জামা কাপড় পরে খাওয়া দাওয়ায় মেতে ওঠা। তবে সব শিশুরা কী এই আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়? হরেক রকম খাওয়া দাওয়া সাথে তারাও কী সমান ভাবে শহরের আর পাঁচটা বাচ্চার মত মেতে ওঠে পুজোর এই দিন গুলিতে? হয়তো না, কারণ আমাদের চারপাশে একটু চোখ রাখলে দেখা যায় রাস্তার ধারে ফুটপাথে, ব্রিজের নিচে বসবাস করে অনেক সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ যাদের কাছে না আছে স্থায়ী বাসস্থান, আর না আছে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, তাদের কাছে দুর্গাপুজোর আনন্দ বিলাসিতা ছাড়া কিছু না। এই সর্বহারা মানুষদের রুজি রুটি বাসস্থানের পাশাপাশি মুখের হাসিটাই আনন্দ নিয়ে আসে তাদের কাছে, এই আনন্দ আরো দুইগুণ বাড়িয়ে তোলার জন্য গত দুই বছর ধরে এমনি কিছু দুঃস্থ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে "DREAM NOTE" নামক "facebook page" এর সদস্যগণ।

"দেবী আগমনের সাথে সাথে নিজেদের আনন্দ ওদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার তাগিদে প্রথমবারের মত উদ্যোগ নিয়েছিলাম"- বললেন এই দলের এক সদস্য রাহুল গাঙ্গুলী। তার বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি ও তার বন্ধু আশীস রায় এই পরিকল্পনার কথা ভাবেন। এর পর দুই বন্ধুর ভাবনা অনুযায়ী পথ চলা শুরু, তাদের এই ভাবনা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন ছিল লোকবলের তাই তারা সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে কম্যুনিটি তৈরি করার জন্য "DREAM NOTE" গ্রুপটি তৈরি করেন ।

পথ শিশুদের পুজোর আনন্দে সামিল করার উদ্দেশ্যে তাদের এই উদ্যোগ, তাই আশীস ও রাহুল তাদের এই পরিকল্পনা ভাগ করে নেয় তাদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে, পরিকল্পনায় আগ্রহী হয়ে যুক্ত হয় মনীষা, রাহুল, পীযূষ, অন্বেষা, এদের মত আরো অনেক সদস্য। তাদের এই উদ্দেশ্যে সফল করার জন্য সবাই সাধ্য মতো অনুদান সংগ্রহ করে,কেউ সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে, আবার কেউ বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে, কোনো কোনো সদস্য আবার সরাসরি খাবার কিনে যুক্ত থাকে এই দলের সাথে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পথ চলা শুরু হয়, ২০২১ সালে ১৪ই অক্টোবর, ওই দিন অর্থাৎ দশমীর দিন ৫০ জন দুঃস্থ শিশুদের হতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার তুলে দেওয়া হয়।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আবারও গতবছর পিতৃ পক্ষের অবসান ও মাতৃ পক্ষের সূচনার দিনে ২০২২ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন হাওড়া রামকৃষ্ণপুরঘাট ও তার সংলগ্ন এলাকার ১০০ পথশিশুদের খাবার বিতরণ করে ওদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে এই দল।

প্যান্ডেল হপিং এর ভিড়ে ধুলো মাখা দুটি হাত যখন আমার নতুন শার্টে টান দিত মনটা খুব খারাপ হয়ে যেতো, মনে হত আমরা এত আনন্দ করি এই দিন গুলোতে, কিন্তু ওরা তো এই আনন্দের কখনো স্বাদই পায়নি, মনে হয় যদি কিছু করতে পারতাম ওদের জন্য, এই ইচ্ছার তাগিদে "DREAM NOTE" দলের সাথে যুক্ত হওয়া - বললেন ' মনীষা চক্রবর্তী'।

গত দুই বছরের তুলনায় আমরা আরো ফান্ড বাড়িয়ে এই ১৫০-২০০ জন পথ শিশুদের খাবার বিতরণের পরিকল্পনায় আছি এবারও আমরা মহালয়ার দিনটিকে বেছে নিয়েছি এই অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য - বললেন পীযূষ সাহা।

সদ্য দুই বছরের উদ্দ্যোগকে আগামী কুড়ি বছর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে অটল এই দল। এই প্রচেষ্টা কে সফল করতে "Dream note" গ্রুপের সকল সদস্যগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের লক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক সদস্য। এই গ্রুপ এর আরও এক সদস্য জানিয়েছে "বিগত বছর গুলোর মত এই বছরেও পথ শিশুদের খাবার বিতরণের জন্য মহালয়ার দিনটিকে বেছে নিয়েছেন "Dream note" গ্রুপের সকল সদস্য। অনান্য বছর গুলির মত এবারও অনুদান সংগ্রহের জন্য পরিচিত, চেনা পরিজন বন্ধু-বান্ধব এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া সাহায্য প্রার্থী "DREAM NOTE"।

গর্বের বিষয় আশীস, রাহুল, সুদীপ্তারা অনেকেই ড:কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের পড়ুয়ারা, আমাদের সহপাঠী। ওদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

প্রতিবেদনঃ সুদীপ্তা
(5th SEMESTER)

আগমনী

কুমারী পুজো ছাড়া অসম্পূর্ণ দেবী আরাধনা

সর্ববিদ্যা স্বরূপা নাত্রঃ সংস্বয়াঃ। একা হিঃ পূজিতা ওয়ালা সর্বং হিঃ পুজিতং ভগৎঃ।।

কুমারী যে সর্ববিদ্যা স্বরূপা এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । একটি কুমারী পুজো করলে সমস্ত দেবী ও দেবতাদের পুজো করা হয়ে যায়। প্রাচীন কাল থেকে পুজোর একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে প্রকৃতির পুজো আর নারী মানেই প্রকৃতি, তাই নারীর পুজোর মধ্যেই প্রকৃতির পুজো করতেন মুনি ঋষিরা। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন শুদ্ধ আত্ম কুমারীদের মধ্যে ভগবতীর প্রকাশ। মহাভারতে ভীষ্ম পর্বে দেখা যায় অর্জুন দেবী কুমারীর পুজো করছেন। বৃহৎ ধর্ম পুরাণ, মৎসপুরাণ, মহাকালসংহিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদিতে কুমারী পূজার উল্লেখ রয়েছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী কোলাসুর নামে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ওঠেন দেবতারা। তিনি ব্রহ্মার কমল সিংহাসন পর্যন্ত দখল করে নেয় বলে কথিত আছে। তখন সকল দেবতারা মিলে দেবী কালিকার স্মরনাপন্য হন। দেবী তখন কুমারী রূপে আবির্ভূত হন এবং কোলাসুরকে বিনাশ করেন তখন থেকেই দেবীর কুমারী পূজার বিধিচালু হয়েছে। অকালবোধনের সময় কোলাসুরকে বধ করার জন্য যখন দেবীকে আরাধনা করার কথা ভাবা হয় তখন স্বয়ং ব্রহ্মা ঘুমিয়ে থাকা দেবীকে জাগানোর জন্য দেবীর স্তপ করেন এবং বিল্ব বৃক্ষের একটি বিল্বপত্রে কুমারী কন্যা রূপে দর্শন দেন।

কুমারী পুজোকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি প্রথম কুমারী পুজো করেন '১৮৯০' সালে গাজীপুরে। গাজীপুরে মনিকা রায় নামে '১০' বছরের একটি বালিকাকে তিনি দেবী জ্ঞানে পুজো করেন এই মনিকারায় পরে সংসার ত্যাগ করে আলমোড়া আশ্রমে থাকতেন এবং যশোদা মা হিসেবে খ্যাত হন। '১৮৯৮' সালে ভগিনী নিবেদিতা সহ আরো অনেকে কাশ্মীর ঘুরতে গিয়ে ওখানকার এক মুসলমান মাঝির কন্যাকে কুমারী হিসেবে পুজো করেন। '১৮৯৯' সালে কন্যাকুমারীতে সেখানকার ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট মন্মত ভট্টাচর্য্যের কন্যাকে কুমারী হিসেবে পুজো করেন। তিনি বার বার বলেছেন কোনো জাত বড় জাত হতে পারে না যদি নারীর পুজো না করে। '১৯০১' সালে '১৮' অক্টোবর বেলুড়- এ একসঙ্গে '৯' জনকে দেবীর স্থানে বসিয়ে কুমারী পুজো করেন স্বামীজি। এটাই বেলুড়ের প্রথম কুমারী পুজো যার ধারা আজও চলছে। শাস্ত্র অনুসারে কুমারীর বয়স হওয়া উচিৎ এক বছর থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত। বিভিন্ন বয়সের কুমারীদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়,

এক বছরের কন্যা --- "সন্ধ্যা"
দুই বছরের কন্যা--- "সরস্বতী"
তিন বছরের কন্যা--- "ত্রিধামূর্তি"
চার বছরের কন্যা --- "কালিকা"
পাঁচ বছরের কন্যা --- "সুভাগা"
ছয় বছরের কন্যা --- "উমা"
সাত বছরের কন্যা --- "মালিনী"
আট বছরের কন্যা --- "কুষ্টিকা"
নয় বছরের কন্যা --- "কালসন্দর্ভা"
দশ বছরের কন্যা --- "অপরাজিতা"
এগারো বছরের কন্যা --- "রূদ্রাণী"
বারো বছরের কন্যা --- "ভৈরবী"
তেরো বছরের কন্যা --- "মহালক্ষী"
চোদ্দ বছরের কন্যা --- "পীঠনায়িকা"
পনেরো বছরের কন্যা ---- "ক্ষেত্রজ্ঞা"
ষোলো বছরের কন্যা --- "অন্নদা বা অম্বিকা"

এই কুমারীর কোনো জাত বিচার করা হয় না, যে কোনো জাতের কুমারীকে পুজো করা যেতে পারে যদি সেই কন্যা সুলোক্ষণা হয়, দেবী পুরাণে বিভিন্ন ফল লাভের জন্য বিভিন্ন বয়সের কন্যাকে পুজো করার কথা বলা হয়েছে । সর্ব কর্মে জয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয় কন্যাকে, ব্যাবসা লাভের জন্য বৈষ্ণব কন্যাকে, পুত্র কামনায় শতদ্রু কন্যাকে এবং প্রচন্ড বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে অম্বযো কন্যাকে পুজো করার বিধান আছে ।কুমারী পুজো করলে অনন্ত ফল লাভ করা যায়।

প্রতিবেদনঃ মনীষ (5th SEMESTER)
ছবি সৌজন্যঃ গুগল

দেশ মাতৃকা উমার বরণ

ইতিহাস সাক্ষী ভারতবর্ষের রাজপুত কি মারাঠারা লড়াই করেছে বহিরাগত মোঘলদের বিরুদ্ধে তখন তারা জয়ধ্বনি দিত আকাশ বাতাস মুখরিত করে "জয় ভবানী" বলে। সনাতন ধর্মের দেবী মা ভবানী সেই মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল দেশ ও সংস্কৃতির রক্ষার অনুপ্রেরণায়, এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন "ভারত মাতা" । "ভারত মাতা" কথাটি এসেছিল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর উনবিংশ শতাব্দীর একটি নাটক থেকে । পরবর্তীকালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসেও এই ভারত মাতার কথা বলেছিলেন। রচনা করলেন দেশ মাতৃকার বন্দনা স্তুতি- "বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

বন্দেমাতরম হয়ে উঠল ভারতের স্বাধীনতা আন্দলনের রণহুংকার।

এরপর ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত মাতার একটি অবয়বও অঙ্কন করেন - গৈরিক বসন পরিহিতা, সাধ্বী এই ভারত মাতা দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমন্বয়ে তৈরী হয়েছিল, তার চার হাতে ছিল অন্ন, শ্বেতবস্ত্র, পুস্তক ও রুদ্রাক্ষের মালা । পরবর্তীকালে সিংহ বাহিনী ভারত মাতা দেবীর কথাও শোনা যায়, যা দেবী দুর্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারত মাতার ছবি দেখা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন মধ্য গগনে । মনে রাখতে হবে সেই সময়ই বেনারসে একটি ভারত মাতা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই মন্দির উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী নিজে ।

পশ্চিমবাংলায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে অনেক প্যান্ডেলে সেই ভারতমাতা পূজিত হন দেবী দুর্গা রূপে। মায়ের পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি, মায়ের বাম হস্তে দেশের পতাকা এবং ডান হস্তে পদ্ম, মায়ের মাথায় তারের মুকুট, মা দাঁড়িয়ে আছেন বড় একটি পদ্মের উপর।প্রচলিত দুর্গোৎসবে প্রতিটি প্যান্ডেলে মায়ের আগমনের পর আমরা, মায়ের সাথে দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে, আর তাদের বাহন এবং মহিষাসুর ও তার বাহন কে দেখতে পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ভারতমাতা দেবীকে একাই দেখতে পাই। যেমন একটি যুদ্ধের পর শান্তি ফিরে আসে, তেমনি মায়ের আগমন শান্তি নিয়ে আসে।

মধ্য হাওড়া চ্যাটার্জীপাড়া অঞ্চলে ভারত মাতা পুজোর শুরু হয় ১৯৭৭ সালে, এই সালে ভারতমাতা প্রতিমা প্রথম যে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় সেজে উঠেছিল তিনি ছিলেন কুমোরটুলির শিল্পী যতীন্দ্রনাথ পাল।

প্রচলিত দুর্গা পুজোর নিয়ম অনুযায়ী মা দুর্গার বোধন হয় মহাষষ্ঠীতে, কিন্তু ভারতমাতা মায়ের পুজোর শুরু মহাসপ্তমী সকাল থেকে, মহাষ্টমী সকালে অঞ্জলি এবং পঞ্জিকা মেনে সময় অনুযায়ী সন্ধি পূজার আয়োজন হয়, সাথে ১০৮ টা পদ্ম মা-কে নিবেদন করা হয় এবং পুজোর শেষে সন্ধিক্ষণে ১০৮ টা প্রদীপ জ্বালানো হয়। নিয়ম মেনে মহানবমী পুজো তারপর মহাদশমী, মা এর সাথে সবাই মিষ্টি খাওয়া, প্রণাম করায় মেতে ওঠেন। একাদশীতে হয় মায়ের নিরঞ্জন। প্রতিবেদনঃ শ্রেয়া(5th semester), বিদিপ্তা(3rd semester)

হাওড়ার ঐতিহ্যের পুজো

দুর্গাপুজো মানেই থিমের জাকজমক নয়, সাবেকি আনাও বটে, পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য খুজে পাওয়া যায় সাবেকি আনাতে, বর্তমানে থিম পুজোর ভিরে শহরে আনাচে কানাচে এখনও সূক্ষ্ম প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করে বনেদিবাড়ীর পুজোগুলিও। আজ সেরকমই হাওড়ার কয়েকটি বনেদি বাড়ীর পুজোর কথা জানবো।

হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়িঃ হাওড়ার বনেদিবাড়ির কথা উঠলে সর্বপ্রথম ওঠে হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়ির কথা । শোনা যায় ১৭৭০ সালে রাজা রামলোচন রায়ের আমলে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। শোনা যায় রাজা একটি বৃহৎ যোগ্য করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় হওয়ায় যোযোগাসনে বসতে পারেননি, তাই মহাপণ্ডিতেরা বিধান দেন তিনি যদি দুর্গা পূজার প্রচলন শুরু করেন, তাহলে তিনি চারটি যজ্ঞের ফল একত্রে পাবেন। মহাপন্ডিতের বিধান অনুযায়ী দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু হয়। সপ্তমীর দিন সকালে পুজো শুরু করা হতো রাজবাড়ির কামানের আওয়াজে। সেই দুর্গাপুজোতে অষ্টমীর দিন লর্ড ক্লাইভ আসেন ৯টি জুড়ি গাড়ি নিয়ে। তিনি মায়ের জন্য ১০৮ টি পদ্মফুল ১০০০০ টাকার মিষ্টি এবং ১০০০ টাকা প্রণামী নিয়ে আসেন। তখনকার নবমীর দিন একটি মোষ ও নটি ছাগল বলি হত। এখন পশু হত্যা বন্ধ বলে বলি দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। এই রাজবাড়ীর সাবেকি পুজোর একটি বিশেষত্ব হল এই বাড়ির প্রতিমার সিংহটিকে ঘোরার মতো দেখতে। যে বছর পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছিল সে বছর ১০৮ টি নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছিল এবং কাঙালি ভোজন করানো হতো। ৯টি গ্রামের লোক একত্রে বসে এই কাঙালি ভোজনে অংশ নিয়েথাকেন। অষ্টমীর সন্ধ্যাআরতি তো রয়েছেই, তারই সাথে দশমীর বিসর্জনের আগে দশমীর দিন
সকাল বেলা একটি নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রচলন ছিল।

হাওড়ার চৌধুরীবাড়িঃ এরপর আমরা আসি চৌধুরী বাড়ির ঐতিহ্যে। আনুমানিক ১৭৮৫ সালে রামকান্ত কুণ্ডু চৌধুরীর আমলে এই পুজোর প্রচলন শুরু হয়। সঠিক সময়কাল এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি । তবে বাড়ি শিব মন্দিরের ফলক স্মৃতিতে পাওয়া যায় ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত। কুন্ডু চৌধুরী বাড়ি রাসমেলা ভারত খ্যাত পূর্ণিমার দিন থেকে এক মাস এই রাস মেলা চলে। কুন্ডু চৌধুরী বাড়ির উত্তরাধিকারী শ্রী অমিতাভ কুঞ্জ চৌধুরীর কাছ থেকে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, এনারা বৈষ্ণবধর্মী, তাই এখানে হরগৌরী রূপে পূজা করা হয় মাকে। কুন্ডু চৌধুরী বাড়ির পুজোতে কোনভাবে বলি হয় না।

এনারা মাকে রন্ধন খাবার অর্পণ করেন না। নৈবিদ্যানুসারে চাল ফল মাকে অর্পণ করা হয়।এনাদের বাড়ির আরেকটি ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য হল এনাদের বাড়ির নৌকাপূজা।শোনা যায় তখনকার বাড়ির পুরুষেরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাজের জন্য বাইরে যেতে নদীপথে। তখন যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন জাতীয় জিনিসের ব্যবস্থা ছিল না, তাই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না সেই কারণেই দশমীর দিন দেবীর কাছে মানত করা হয় বাড়ির পুরুষেরা যেন সুস্থ সবল ভাবে ফিরে আসে তাহলে তারা বাসন্তী পূজা করবেন, আজও সেই রীতি চলে আসছে। দশমীর দিন সকালে একটি নৌকা তৈরি করে পুজো করা হয়। আন্দুল রাজবাড়ির পুজো যেমন শুরু হয় কামানের আওয়াজে ঠিক সে রকমই কুঞ্জ চৌধুরী বাড়ির পুজো শুরু হতো বন্দুকের আওয়াজে। কুন্ডু চৌধুরী বাড়ির আরেকটি রীতি হচ্ছে বাঁশ পুজো যেটি উল্টো রথের দিন পালন করা হয়।

বেলকুলাইয়ের দাসবাড়িরঃ বেলকুলাই গ্রামের দাস পরিবারের পুজোর ইতিহাস ততোধিক পুরানো নয়। কিন্তু এই পরিবারের পুজোর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এদের পুজো শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। ঐবছর বাড়ির এক প্রবীণ সদস্য কাদম্বিনীদেবী স্বপ্নে মায়ের দেখা পান। মূলত তারই জেদে বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তার দুই ছেলে চন্দ্রকুমার ও অধরচন্দ্র ঐবছর পুজো শুরু করেন। তার আগে এই পরিবার কেবল বৈষ্ণব উৎসব ছাড়া অন্য কিছু পালন করতেন না। যে ঠাকুর দালানে কুলদেবতা নারায়ণের পুজো হত সেখানেই দুর্গাপুজো শুরু হয়। নারায়ণের মন্দিরটি জমিদারবাড়ি সংলগ্নই বলা যেতে পারে। বোধন ষষ্ঠী বাড়ির কাছে বেড়া দেওয়া একটি বেলগাছের তলায় হয়। সেইসময় পারিবারিক দেবতা নারায়ণকেও সেখানে আনা হয়। সঙ্গে থাকেন রূপোর কুনকেতে স্বরূপী, ধনলক্ষী, তাঁকে ঠাকুরদালানে দুর্গার পাশেই বসানো হয়। তার পাশে বসানো হয় কুলদেবতা নারায়ণকে।বৈষ্ণব পরিবার হওয়ায় এই পুজোয় বলি নিষিদ্ধ। এমনকি ফল বলিও হয় না। সন্ধিপুজোর সময় কলাপাতায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়, সেই সময় গ্রামের বহু মহিলা এই প্রদীপ জ্বালানোয় অংশগ্রহণ করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের সব মহিলার দুর্গা পুজোয় অংশগ্রহণ এই পরিবারের পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রতিবেদনঃ
সুকন্যা (3rd SEMESTER)

সুচরিতা (5th SEMESTER)
ছবি সৌজন্যঃ গুগল

থিয়েটার থেকে শুরু, টেলিজগতে জনপ্রিয় 'DODO DA' ওরফে অর্পণ ঘোষাল

একদিকে থিয়েটারের লাইভ মঞ্চ অন্য দিকে টেলিভি-শনের জগৎ , সবকিছু নিয়েই মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এক মুখ অর্পণ ঘোষাল । বেড়ে ওঠা এই হাওড়া শহরে। ভালোলাগা থেকে থিয়েটার শুরু করে টিভি সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালোবাসার চরিত্র হয়ে ওঠার গল্প শোনার ইচ্ছাতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম তার কাছে । ঘন্টাখানেক আড্ডা, হাসি,গল্পে বেশ ভরে উঠেছিল একটা দুপুর ছিল আশীষ, সুচরিতা, সুদীপ্তা, শ্রেয়া, মৌপিয়া, শ্রেয়া।

থিয়েটার করবো এই ভাবনাটা এলো কীভাবে?

কিছু না ভেবেই মানে আমি এমনি গেছিলাম থিয়েটার কী হয় দেখতে, জানতে। প্লান করে তো কখনো ভালোবাসা যায় না কাজের ক্ষেত্রেও হয় না, থিয়েটারের ক্ষেত্রেও হয় না। থিয়েটার টাই আমার ভীষণ ভালো লাগতো । আমরা যেভাবে থিয়েটার করেছি সেই প্রসেসটাই আমার খুব ভালো লাগতো , এবার কেন ভাল লাগে তার অনেক রকম কারণ আছে । পরে আমি বুঝেছি কেন ভালো লাগে যে কাজটা আমরা করি সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে করা হয়। মানে আমি যে কাজটা করছি খুব গুরুত্ব দিয়ে আর আমার পাশে যে কাজটা করছে তাকেও আমি খুব গুরুত্ব দিচ্ছি চেষ্টা করছি কাজটা যাতে ভালো হয় , তো এই ভালোলাগাটাই , যেখানে কোনো কমপ্লিকেশন নেই একে অপরকে সাহায্য করছি এটাই আমার থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথম দিন যখন ক্যামেরার সামনে এলে কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

প্রথম ক্যামেরার সামনে আমি অভিনয় করেছিলাম সজারু কাঁটা ওয়েব সিরিজে, হৈচৈতে হয়েছিল । প্রথম যখন গিয়েছিলাম তখন একটু কেমন লাগছিল , ক্যামেরার তো একটা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা থিয়েটারের থেকে একটু আলাদা । একটু বুঝে যাওয়ার পর আর তেমন অসুবিধা হয়নি আমার কনফিডেন্স কখনো নষ্ট হয়নি কনফিডেন্টই ছিলাম আমি।

কোন দিনটা তোমার কাছে বেশি রোমাঞ্চকর প্রথম থিয়েটারে আসা না প্রথম পর্দায় আসা?

প্রথম থিয়েটারে আসাটা আমার বেশি রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে ।

থিয়েটারে আশা থেকে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে বাড়ির লোকের সাপোর্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?

খুব একটা সাপোর্ট ছিল না । কখনো আশাও করেনি যে আমি এতটা সাকসেসফুল হব। যতটুকু হয়েছে এতটুকুও কেউ আশা করেনি। কিন্তু আমি জানি না কেন প্রথম দু তিন বছরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি যদি চেষ্টা করি তবে আমি সাকসেসফুল হব। প্রফেশনাল সাকসেস বলতে অনেকেই টাকা পয়সা এসব ভাবে কিন্তু প্রফেশনালিজমটা অন্য জায়গায় যেটা হলো কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা । আমি এমন অনেক লোককে চিনি , অফিস চিনি যেখানে লোকে অনেক মাইনে পায় কিন্তু কাজ সেভাবে করে না।আবার অনেক মানুষ আছেন তারা হয়ত বেশি টাকা পায় না আবার খ্যাতিও পায় না একটা ভালোবাসা

থেকে সুন্দর ভাবে কাজটা করে যায় । তো আমরা বর্তমানে প্রফে-শনালিজমকে গুলিয়ে ফেলেছি , আমরা টাকা দিয়ে ওটাকে বিচার করি।

থিয়েটারের পর ওয়েব সিরিজ টিভি সিরিয়াল কোথাও গিয়ে কী মনে হয় অভিনয় ধারনাটা বদলে গেছে?

আলাদা তো বটেই এটার মানে যদি কাঁচি দিয়ে অপারেশন হয়, ক্যামেরা হল তার মানে লেজার দিয়ে অপারেশন। যখন আমরা থিয়েটার করছি তখন আমরা ভাবি এটাকে তো ভালোভাবে করতেই হবে, ভালোভাবে রিহার্সাল দেবো, ভালোভাবে করব; আর যখন ক্যামেরায় কিছু কাজ হয় তখন সেটাকে মানুষ বেশির-ভাগই প্রোডাক্ট হিসেবে নেয় ।

যেহেতু তুমি এখন একটা পরিচিত মুখ তো পাবলিক প্লেসে গেলে কীভাবে ডিল করো?

সেটা তো হয়ই ,
টিভিতে লোকজন দেখছে মানে এটা ভাবে আরে কিছু করেছে ছেলেটা! আমরা এখন মানুষের সফলতা দেখেই মানুষের ভ্যালুয়েশনটা করি। নিজের ভালো হওয়াটার উপর অতটা ভরসা হয় না যখন অন্য লোকেরা বলছে হ্যাঁ তখন ভরসা হয় । চারটে লোক যখন ভালো বলছে তখন বুঝতে পারছি হ্যাঁ তার মানে ভালোই হয়েছে।

মেমোরিবল ফ্যান মোমেন্ট বা একটি এক্সপেরিয়েন্স যদি শেয়ার করো।

মেমোরেবল বলতে যখন থিয়েটার করতাম একাডেমিতে আমি চিনিও না হয়তো এমন লোকজন শান্তিপুর থেকে এসেছে বা বর্ধমান থেকে এসছে, সে তো আমায় তখন জানেও না এত খ্যাতিমান লোক তখন আমি ছিলামও না কিছু লোক অভিনয়টা দেখেছে তারপরে পুরো অভিনয়টাকে গুছিয়ে বলছে; মানে ঠিক কতটা মনোযোগ দিয়ে সে দেখেছে আমি সেটা বুঝতে পারছি । এই মোমেন্ট গুলো আমার কাছে খুবই মেমোরেবল। আমার এই টেলিভিশন বা ওয়েব সিরিজ করার পরে হয়েছে কি মানে একটা তাৎক্ষণিক উত্তাপ থাকে সবকিছুর! ওই আর কি! তুমি বেস্ট, তুমি সবকিছু। অত ভালো আমি করিনি তাও লোকজন যেভাবে বলছে এই যে লোকজনের উত্তাপ তাই যে ভালোবাসাটা। এখন অনেকে আছে যেমন বাড়িতে চলে আসে, উপহার দেয়, আমি বলি যে আমি নেব না আমি যে কাজটা করছি তার জন্য তো আমি পারিশ্রমিক পেয়েছি। তাও তারা ভালোবেসে কিছু নিয়ে আসে এগুলো খুবই মনের কাছের।

অভিনয় জগতে গডফাদারে বিশ্বাস করো?
অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই আমার অভিনয়ে আসা। আমি ওনার কাছেই প্রথম কাজ শুরু করি।

যখন কোন নেগেটিভ কমেন্ট বা নেগেটিভ রেসপন্স আসে তখন সেটাকে কীভাবে ফেস করো বা হ্যান্ডেল করো?
সত্যি কথা বলতে সেরকম কিছু নেগেটিভ কমেন্ট বা রেসপন্স পাই না; মানে কেউ এভাবে নেগেটিভ কমেন্ট করেও না। তবে কখনো কখনো কোনো ছবি বা ভিডিও যখন ভাইরাল হয় তখন
অনেকেই বলতো, কেমন ছেলেটা! ও তো অমুকের মতো মুখ! তখন বেশ আমার মজাই লাগতো। এগুলো খুব একটা খারাপ ভাবে আমি নিইনি।

বড় পর্যায়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে?

ইচ্ছা তো অবশ্যই আছে। অভিনয় যখন করছি তখন কেন করব না ! তবে হ্যাঁ এবার দেখা যাক সুযোগ পাবো কিনা।

স্বপ্নের চরিত্র কোনটা সেটা পর্দায়? নাকি থিয়েটারে নাকি ওটিটিতে?

ওরকম স্বপ্নের চরিত্র বলে আমার কিছু নেই। যেমন আমার কোন প্রিয় খাবার বা প্রিয় রঙ কিছু নেই।

জনপ্রিয় মুখ (বিশেষত পর্দায়) থাকলে থিয়েটারে দর্শক বাড়ে এই বিষয়টা কী ভাবে দেখো ?

থিয়েটার বা সিনেমা হলে তুমি যখন টিকিট কেটে ভেতরে যাচ্ছ তুমি তো জানো না ভিতরে ঠিক কি হতে চলেছে। কিন্তু থিয়েটারে যদি কোন মানুষের চেনা মুখ থাকে তাদেরকে ভালো লেগেছে আগে কোন সিরিয়ালে বা বড় পর্দায় তখন লোক ভাবে আচ্ছা ইনি আছেন, তখন তারা ২০০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটার ভরসা পান।

থিয়েটার বা যাত্রা থেকে না আসলে কি অভিনেতা হওয়া যায় না?

আমার ব্যক্তিগত মতে মনে হয় আমাদের এখানে যেহেতু অভিনয় ইনস্টিটিউট বা অভিনয় শেখার মত জায়গা সেভাবে নেই, কেউ যদি অভিনয় শিখতে চায় কেউ জানবেই না যে কোথায় যেতে হবে বা কীভাবে শিখতে হবে অনেকেই বলবে যে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও তাহলে আমি সিরিয়ালের চান্স করে দেবো । বিদেশে অনেক জায়গা আছে শেখার মত, বাংলায় সেই জায়গাটা থিয়েটার দিতে পারে।

আগামী দিনে যারা অভিনয় জগতে আসতে চায় তাদের কী টিপস দেবে?

আমি কাকে টিপস দেব আমাকে কেউ টিপস দিলে আমার ভালো হয়! তবে হ্যাঁ মন দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কাজ করতে হবে।

সামনেই তো পুজো ছোটবেলার পুজো কেমন কাটতো আর এখনকার পূজা কেমন কাটছে?

আমি পূজায় কোনদিনই সেরকম ঠাকুর দেখতাম না। ছোটবেলায় যেটা হতো লোকে আমাকে জামা কাপড় দিত তবে এখন আমি বড় হয়ে গেছি এখন আমাকে লোকদের জামা কাপড় দিতে হয়। লোকজন এখন মুখিয়ে থাকে ওই চার দিন যতটা পারে একসাথে আনন্দ করে নেয়, আগে যেটা শান্তভাবে পূজো হত, এখন কাজের ব্যস্ততার মাঝখানে চার দিনে মানুষ পুরোটা কভার করতে চায়।

Rapid fire

টেলিভিশন / ওয়েব সিরিজ
-কোনটাই নয়

ফানি ক্যারেক্টার / সিরিয়াস ক্যারেক্টার
-সিরিয়াস ক্যারেক্টার

মুকুল / ডোডো
-মুকুল

হাওড়া / কলকাতা
-হাওড়া

সোশ্যাল মিডিয়া এপিসিয়েশন / ব্যাকস্টেজ এপ্রোসি-য়েশন
-ব্যাক স্টেজ অ্যাপ্রিশিয়েশন

সেলিব্রেটিলাইফ / সাধারণ লাইফ
-সেলিব্রেটি হয়ে নরমাল আছি

দুর্গাপুজাতে কলকাতা / বাইরে
-কলকাতা হাওড়া

অনুলিখনঃ মৌপিয়া

ট্যাটু এঁকে বিশ্বজয়ে, আলাপচারিতায় সৈকত রায়চৌধুরী

মাঝ গঙ্গায় ট্যাটু করে এখন জনপ্রিয় সৈকত রায় চৌধুরী । ছিনিয়ে নিয়েছেন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এর খেতাব। একথায় বলতে গেলে তিনি হাওড়ার গর্ব। পৌঁছে গেলাম হাওড়ার সালকিয়া তে।অনেক ব্যস্ততার মাঝখানে গল্পে গল্পে জেনে নিলাম তাঁর এই জগতে আসার কাহিনী। তিনি জানালেন কীভাবে বিন্দু বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়।

ট্যাটু একে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, জার্নিটা শুরু হয়েছিল কিভাবে? কত বছর ধরে এই কাজের সাথে যুক্ত?

- ট্যাটু আঁকার জার্নিটা শুরু হয়েছিল 2020 সালে, তখন আমি মাধ্যমিক দি। তারপর লকডাউন হয়। সেই সময় ঘরবন্দি হয়ে ভেবেছিলাম যে কিছু একটা করতে হবে।তো তখন আমি YouTube -এ আসি। তখন ওখানে আমি আকার ভিডিও দিতাম। একদিন রাতে সোশাল মিডিয়া মানে YouTube এ দেখছিলাম যে ট্যাটু কিভাবে আঁকা হয়। সেই জায়গা থেকেই আমার আগ্রহ , আমার তখন থেকেই মনে হল আমি তো আঁকা জানি। আমি ট্যাটু করতে পারব । এই থেকেই আমার ট্যাটু আঁকার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম থেকে কেউ সাপোর্ট করেনি। আমি যার কাছে শিখতে যেতাম সে আমাকে সেই ভাবে গুরুত্ব দিয়ে শেখায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। দেখে যতটুকু শেখা হয়। তারপর একদিন পারমিশন নিয়ে মেশিনটা কিনলাম। মেশিনটা কেনার পর দুই থেকে তিনজনকে ট্যাটু করে দিয়েছিলাম। ওই স্টুডিওতে বসে। তারপর আমাকে বলে তুমি আগে আঁকা শিখে এসো, সেটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছিল আমাকে এটা বলতে পারতো যে তুমি আগে একটু প্র্যাকটিস করো। আমাকে ডাইরেক্ট বলেছে তোমার দ্বারা ট্যাটু হবে না। তুমি যদি ট্যাটু করো হয় তুমি গুমটিতে বসে করবে, না হয় মেলাতে। তারপর থেকে ঠিক করলাম, যে ট্যাটুই করব, তবে এবার একা করবো। বাড়িতে এসে সেটআপ রেডি করলাম। কিছু ছিল না বিশ্বাস করো, নরমাল দুটো মেশিন ছিল একটা লাইনিং এর জন্য আর একটা সেটিং এর জন্য ব্যাস আমি এটুকু জানতাম। 2020 থেকে 2023 পর্যন্ত তিন বছর হয়ে গেল, এখন এটা আমার নিজের স্টুডিয়ো।

অন্যরকম এই পেশাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি সাপোর্ট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

বাড়িতে সবাই কিন্তু সাপোর্ট করেনি,বাবা বলেছিলেন,তোর লাইফ যেটা ঠিক মনে করিস করবি। তারপর থেকে জার্নিটা শুরু, আর এখন তো সবাই পাশে আছে।

ট্যাটু করানোর ফলে শারীরিক কোন সুফল বা কুফল কী হতে পারে?

প্রথম কথা ট্যাটু করে তার শখের জন্য, কেউ কাউকে রিপ্রেসেন্ট করার জন্য করে বাকারো স্মৃতির জন্য করে, কেউ নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য করে। এবার যদি কুফল বলো সেটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করছে। যারা কাজ করাবে ,যারা নিজেদের শরীরে ট্যাটু করতে চায়, তারা কোন আর্টিস্ট সিলেক্ট করছে, আমি কোনো আর্টিস্টকে ছোট করবো না। যারা ধরো, হাইজিং মেন্টেন করে কাজ করে না ,সে ক্ষেত্রে বডিতে ইনফেকশন হবেই। আর যারা প্রফেশনাল ভাবে কাজ করে সেক্ষেত্রে কোনো ইনফেকশন আসার চান্স নেই।

সোশ্যাল মিডিয়া মারফত এখন একজন খুবই জনপ্রিয় ট্যাটু শিল্পী, মাঝ গঙ্গায় বসে ট্যাটু একে বিশ্ব রেকর্ড-এমন ভাবনা এলো কিভাবে?

আমি একদিন ইনস্টাগ্রাম দেখতে দেখতে Harvard World record বলে ওদের ওয়েবসাইট দেখে ওদের মেল করি, তো মেল করার পর ওদের কন্ডিশন বলে যে এমন কিছু একটা ক্রিয়েট করতে হবে যেটা আজ অব্দি কেউ করেনি, এটাই ন্যাচারাল তবেই তো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হবে। তো বেশ এই টুকুই কথা বলেছিল।তো তখন আমার মাথায় এল যে মানুষ ডাঙ্গায় বসে ট্যাটু করে। কেউ জলের ওপর ট্যাটু করে না, সেই থেকেই এই ভাবনা।

যখন জানলেন আপনি এমন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তখন কি মনে হয়েছিল কেমন অনুভূতি হয়েছিল সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

যতক্ষন না, সার্টিফিকেটটা হাতে পাচ্ছিলাম, ততক্ষণ খুব চাপে ছিলাম যখন হাতে পেয়ে গেলাম তখন ব্যাস নরম্যাল।

এরপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

দেখা যাক এই ট্যাটু ইন্ডাস্ট্রিকে কতটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমি।

এই মুহূর্তে কি ধরনের ট্যাটু চাহিদা সবথেকে বেশি?

আমার কাছে আমি সব ধরনের ট্যাটু করি আর আমার বেস্ট যদি বলো তাহলে আমি পট্রেট আর কালারের উপর কভারাফ করি।

আরো যারা ট্যাটু শিল্প নিয়ে কাজ করতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইবেন?

তাদেরকে বলব যে ট্যাটু হচ্ছে একটা আর্ট এটা আগে বোঝো, রেস্পেক্ট দাও, কোনো কাজই ছোট নয়। আর কোনো কাজ যদি রেসপেক্ট ও ডেডিকেশন দিয়ে করা হয় তাহলে সাফল্য পাওয়া যায় ।এই কাজে সব থেকে বেশি দরকার ধৈর্য। ধৈর্য না দিয়ে এবং নলেজ না থাকার সত্ত্বেও অনেক মানুষকে দেখেছি যে মেশিন ধরে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে এটা একদমই ঠিক নয় । কারন আমরা কারোর জীবন নিয়ে খেলতে পারিনা , আমাদের দেখতে হবে যাতে আমাদের জন্য কারোর অসুবিধা না হয়। এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, আমি এটুকুই বলবো যে আরও আর্টিস্ট আসুক আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে ।ইন্ডাস্ট্রিটা আরও গ্রো করবে। আমি এটাই চাই।

রিয়া, রাইমা, পামেলা (3rd Semester)
অনুলিখন: সুকন্যা(3rd Semester)

হাওড়ার গর্বের ঐশ্বর্য মান্না

কমনওয়েলথ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয়ী হাওড়ার ডুমুরজলা কলা বাগান লেনের বাসিন্দা ঐশ্বর্য মান্না। পাশাপাশি তিনি রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ীর মুখোমুখি হয়েছিল টিম দৃষ্টিকোণের **মৌপিয়া, সুদীপ্তা, ও শ্রেয়া**।

প্রথম খেলা শুরু কত বছর বয়স থেকে?

সাঁতরাগাছি কেদারনাথ স্কুলে ক্লাস ৮ থেকে ক্যারাটে শুরু, তারপর ক্লাস ১১ থেকে ক্যারাটে ভালো লাগা শুরু হলো।
অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন কার কাছে?
ছোটবেলা থেকে পরিবারের সহযোগিতা এবং পাশে পেয়েছি সবসময় । পরিবার সবসময় শিখিয়েছে যে মেয়ে বলে কখনো পিছিয়ে থাকতে নেই।

পরিবার কতটা সহযোগিতা করেছেন?

পরিবার সবসময় পাশে ছিল এবং মা-বাবা শিখিয়েছেন মেয়ে বলে শুধু ঘরে রান্না বান্না বা ঘর গোছানো নয়, মেয়েরা ঘরে বাইরে সব সামলাতে পারে।

বর্তমানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেমন লাগছে?

বর্তমানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব ভালো লাগছে কারণ, বিদেশের মাটিতে আমি আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরেছি । প্রথম যখন ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমসে যাই পাশাপাশি যে দেশগুলি ছিল নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কানাডা তার মাঝে ভারত সেই সময়টা খুবই গর্বের।

ভবিষ্যতে কী লক্ষ্য?
অবশ্যই গোল্ড এর জন্য প্রতিযোগিতায় নামব কারণ, আমি আমার দেশকে ভবিষ্যতে গোল্ড এনে দিতে চাই। আর তার জন্য আমি আমার পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করব। কারণ, আমাদের দেশ কোন কিছুতে পিছিয়ে নেই। আর আমি চাই আমার সাধ্যমত মানুষের পাশে দাঁড়াতে, তাদের জন্য কিছু করতে ।

বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের জন্য কিছু বার্তা?

আমার মতে, প্রত্যেকটা নারী হচ্ছে মা দুর্গার রূপ । নারীদের কখনো নিজেকে অবহেলার চোখে দেখা উচিত না। একটি মেয়ের সম্পূর্ণ চেষ্টা যদি থাকে এবং সে যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে " আমরা নারী আমরা সব পারি"। কারণ, একটি মেয়েকে সমাজের মানুষ পিছনের সারিতে রাখে, আর আমাদের কাজের মাধ্যমে সমাজকে জবাব দিতে হবে । আর এখন মেয়েরা সব পারে যেমন সংসার,নিজের পরিবার,বাচ্চা সামলাতে পারে,তার সাথে রান্নাও পারে,জিমও যেতে পারে, সাথে ওয়েট লিফটিং এবং গাড়িও চালাতে পারে,অনেক প্রাণ বাঁচাতে পারে । আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট পরে অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারবো । আর মেয়েদের হাত এমন একটি হাত সেটি যেমন ভালো কাজে লাগে সেটি দুষ্টের দমন এর কাছেও লাগে আর মেয়েদের নিজেদের বোঝাতে হবে আমরা পিছিয়ে নেই আমরা সব পারি, "OF OUR NEXT GENERATION"।

ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারকে কতটা সময় দেন?

বেশি সময় আমি পরিবারকেই দেবার চেষ্টা করি । কারণ, মা-বাবায় সব আমার কাছে । আর আমি এখন কোন কিছু করতে আর ভয় পাই না কারণ, কিছুদিন আগেই আমি আমার নিজের ছোট ভাইকে হারিয়েছি ,তার জন্য পুরো পরিবারই শোকাহত । কিন্তু আমি অনুভব করি আমার ভাই আমাকে দেখছে এবং অনুপ্রেরণা দিচ্ছে ,আজ আমি একা হলেও আমরা এখনো দুজন,আমার মধ্যে আমার ভাই জীবিত।

অবসর সময় কি করতে ভালোবাসেন ?

আমি খুব লিখতে ভালোবাসি, যে কোন বিষয়ের উপর অবসর সময় আমি অনেক কিছু ভাবি এবং লিখি । আর কিছুদিন হলো অবসর সময় অনেকগুলি বিজ্ঞাপন সংস্থার সাথে কাজ করেছি মডেলিংয়ের।

ছোটবেলায় পুজো কেমন কাটতো ? আর এখন কেমন কাটে?

ছোটবেলায় পুজোয় মা বাবা ভাইয়ের সাথে কাটতো। সবাই একসাথে ঠাকুর দেখতে যেতাম । মা বাড়িতে ভালো-মন্দ রান্না করত । এখন সেইভাবে আর ঠাকুর দেখা হয়ে ওঠেনা । কিন্তু আমি জিতে আসার পর অনেক দুর্গোৎসব পুজো কমিটি থেকে সম্বর্ধনা দেন,এবং সেই সময়টা খুবই আনন্দ এবং গর্বের মুহূর্ত ।

Rapid fire

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন VS বিদেশের মাটিতে নিজের নামে দেশের পতাকা ?

বিদেশের মাটিতে নিজের নামে দেশের পতাকা।

ছোটবেলায় ক্যারাটে হাতে খড়ি VS হায়দ্রাবাদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ ?

ছোটবেলায় ক্যারাটে হাতে খড়ি।

Bruce lee VS Vidyut Jammwal ?

Vidyut Jammwal

ক্যারাটে বাদ দিয়ে, ব্যাডমিন্টন VS টেনিস ?

টেনিস।

অবসর সময় বাড়ির লোকের সাথে সময় কাটানো VS পুরনো বন্ধুদের সাথে গল্প ?

অবসর সময় বাড়ির লোকের সাথে সময় কাটানো।

একাই যাব ঠিক করেছিলাম, কারণ সাফল্য পেলে সেটা শুধু আমারই হবে : লিপিকা বিশ্বাস

একদিকে পর্বতারোহী অন্য দিকে সাইকেল নিয়ে বিশ্ব জয়, সাইকেলের চাকা গড়িয়ে পাড়ি দেয় দেশ থেকে দেশান্তর, আবার অন্যদিকে ভারতীয় পূর্বরেলের একজন আদর্শ কর্মচারী, এককথায় দশভুজা শ্রীমতী লিপিকা বিশ্বাস। তিনি ভারতীয় প্রথম মহিলা যিনি সাইকেলে করে ঘুরছেন দেশ বিদেশ, সমগ্র ইউরোপ আজ তার হাতের মুঠোয়, তার বাড়িতে হাসি, গল্প, আড্ডায় কাটলো প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়, খুব জানতে ইচ্ছা করছিলো, কীভাবে শুধুমাত্র সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ দেশে বিদেশে, কীভাবে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা তাই সরাসরি প্রশ্নে-

একজন মাউন্টেনিয়ার থেকে সাইকেলবিদ এই জার্নিটা কেমন ছিল?

অ্যাডভেঞ্চার জগতে এসেছি ১৯৯৪ সালে, এর আগে বিভিন্ন কোর্স করি, ১৯৯৫ সালে কালিন্দিপাস যাই যার উচ্চতা ১৯৫০০ ফিট, তাই দিয়ে শুরু, যেটা অনেক কারোর কাছে স্বপ্ন থাকে এরপর ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করি কিন্তু বারবার প্রকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সফল হইনি, তাই ঠিক করি এরপর আর না, তবে আগে থেকেই সাইকেলিং করতাম, ২০১১ তে কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী, ২০১২ তে গৌহাটি থেকে তাওয়াং গেছি, তখন মনে হল সাইকেলটা নিয়ে বেরোনো যাক, একাই যাব ঠিক করেছিলাম, কারণ সাফল্য পেলে সেটা আমারই হবে। প্রথম গেলাম স্ক্যান্ডিনেভিয়ার,, ২০১৮ সালে ৬ টি দেশ ঘুরেছিলাম জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড, এছাড়া আরও অনেক দেশেই গেছি, অস্ট্রীয়া, গ্রিস, শ্রীলঙ্কা।

আমরা সাধারণত ভ্রমণ করতে বাস, ট্রেন, ফ্লাইট এসব মাধ্যম গুলিকে ব্যবহার করে যাই সেখানে আপনি সাইকেল কে বেছে নিলেন কীভাবে?

সাইকেল সবথেকে প্রিয় কারণ স্বাধীনভাবে নিজের মত করে ঘোরা যায়, কোনো খরচা নেই, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এর সম্পূর্ণ খরচাই বেচে যায়, ফিট থাকি, প্রধান কারণ পরিবেশ বান্ধব, তাই বর্তমানে একটা বাইক এর জায়গায় সাইকেল ব্যবহার করাই ভালো, সবকিছু মিলে সাইকেল একটা ভালোলাগা ও ভালোবাসার জায়গা।

সাইকেল করে এত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেন কখনো কোনো বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে?

হ্যাঁ।আমি সাইকেলের পার্টস গুলো তো খুলে বক্সে প্যাক করে নিয়ে যাই, প্রথম বার যখন জার্মানী গেলাম , এবার সাইকেল সেট করার জন্য মেকানিক খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না, কারণ ওখানে সাইকেলের দোকানে আগে থেকে বুকিং করতে হয়, দেড় দিন ধরে মেকানিক না পাওয়ার পর নিজেই সেট করার সিদ্ধান্ত নি, আমার সাইকেল যে আরকি সেট করে, সে যখন করত আমি দেখতাম, তাই আমি নিজেই সেট করলাম, তারপর একটা সাইকেল এর দোকানে নিয়ে গেলাম তারপর ওরা চেক করে দিলো, প্রথম যেখানে যাওয়ার কথা ছিল দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে মাঝে মাইন্স বলে একটা জায়গায় ছিলাম ওখানে টেন্ট করতে দেয় না, আর ওই জায়গায় হোটেল ভাড়া অনেক, তখন এক দম্পতির সাথে দেখা হয় ওনারা আমায় ওনাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন, এরকম অনেকে বাধাই ওভারকাম করেছি।

এর পরবর্তী সময়ে কোথায় যাবেন ভাবছেন? বা কি পরিকল্পনা?

- আগে যেমন বেশ কিছুদিন ধরে পরিকল্পনা করতাম, আগে দেশ গুলো ঠিক করলাম, এখন যেটা হয়েছে মূলত করোনার পর কোন দেশ হঠাৎ করে বন্ধ করে দেবে তার জন্য এখন কিছু পরিকল্পনা করছি না, কিন্তু যখন মনে হবে এবার বেরোবো তিন মাস আগে ঠিক করে বেরিয়ে যাব, আর অনেক দেশে যেতে চাই ইতালি, দক্ষিণ এশিয়ার দেশ যেমন, ইন্দোনেশিয়া, কম্বডিয়া, কারণ এই দেশের গ্রামীন এড়িয়া খুব সুন্দর তো সেটা দেখতে চাই, এছাড়া বহু জায়গা, আসলে সারা দুনিয়াটাই দেখতে চাই।

এর পরবর্তীকালে যারা ভাবছে এই ভাবে সাইকেল নিয়ে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করবে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান?

- যারা সাইকেল নিয়ে ট্যুর করবে ভাবছেন, প্রথম মনে রাখতে হবে সেফটি, কারণ যারা কলকাতায় বা এমনি যারা সাইকেল চালায় ট্রাফিক আইন মানেন না, তো আমার মনে হয় যেখানে সাইকেল চালানোর রাস্তা আছে সাইকেল চালাচ্ছি, কোথাও কোথাও হাঁটার রাস্তা আর সাইকেল চালানোর রাস্তা এক সেখানে কিন্তু আমরা, যারা হেঁটে যাচ্ছে তাদের পাওরিটি দিই কিন্তু এখানে যারা সাইকেল চালায় তারা মনে করে আমায় সিগন্যাল মানার দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে বিপদ হয় ও অনেকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে সেটা যাতে না হয় তা দেখা, ও যেই জায়গায় যাচ্ছি সেই জায়গার নিয়ম কালচার মেনে চলা।

আপনাকে যদি বলা হয় যারা ঘুরতে করতে ভালোবাসে বা এককথায় যারা ভ্রমণপিয়াসী তাদেরকে ভ্রমণ সংক্রান্ত tips দিতে তাহলে কি বলবেন?

- একটা হলো আমি যেখানে যাচ্ছি বা যেতে চাই সেই জায়গার সম্পর্কে জানা জায়গাটা কিরকম, যারা ওই জায়গায় গেছে তাদের থেকে সেই জায়গা সম্পর্কে জানা, খুব ভালো করে সেই সম্পর্কে স্টাডি করা সেই জায়গার রীতিনীতি কালচার সম্পর্কে খুব ভালো করে জেনে নেওয়া, আর একটা আমি গাড়ি করে যাচ্ছি মানে অনেক কিছু নিয়ে গেলাম আর নোংরা করে দিয়ে চলে এলাম সেটা না করা, কারণ পরিবেশে এত কিছু হচ্ছে আমাদের জন্য, তাই সেই জায়গার পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা।

আপনি তো এতে দেশে ঘুরেছেন আপনার চোখে ভারত ছাড়া আর কোন দেশ সব দিক থেকে সুন্দর এবং কেন?

নরওয়ে, নরওয়ে ভীষণ সুন্দর আর চারিদিকে সবুজ গাছপালা, আর চারিদিকে সবুজ দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়, একদিন এমন হয়েছে নরওয়ের ভস বলে একটি শহরে রেল স্টেশনে রাত কাটাবো ঠিক করলাম, রাত ১২ টার সময় ঘুমাব তখন রেল স্টাফ এসে বলে আমি স্টেশন ওয়েটিংরুম বন্ধ করব তুমি এখানে থাকতে পারবে না বাইরে কোথাও টেন্ট করো এটা অফিসিয়ালি আমায় বন্ধ করতেই হবে, তখন পাশে একটা সাইকেল গ্যারেজ ছিল একপাশে শুয়ে রাত কাটাই ঘুম হয়েনি কিন্তু পরের দিন আবার সাইকেল চালাই, কারণ বেরিয়ে যা দেখেছি আমায় ক্লান্ত হতে দেয় না, এতো সুন্দর।

সামনেই পুজো তো ছোটো বেলায় পুজো কিভাবে কাটিয়েছেন?

- ছোটোবেলার পুজো মানে পড়ার প্যান্ডেলে আনন্দ করা, নতুন নতুন জামা পাওয়া, আর ছোটো বেলায় নতুন জামা পাব এটাই অনেক আনন্দের বিষয় ছিল, আর আমি একটা বড় পরিবার থেকে বিলং করি, আমরা সবাই ভাই বোন মিলে ঠাকুর দেখা, প্যান্ডেলে বসে আড্ডা দেওয়া, এছাড়া বাড়ির বড়দের সাথে ঠাকুর দেখা পরিবারের সবাই আসবে মজা করে কাটত এখন এখন তো পরিবার গুলো ছোটো হয়ে গেছে তাই আমার কাছে পুজো মনে পরিবারের সবাই একসাথে হয়ে সময় কাটানো।

আর এখন কিভাবে পুজো কাটান?

- দু বছর হয়েছে মাঝে, পুজো মানে হচ্ছে কোনো এক্সপ্রিরেশন চলে যাওয়া, ঢাকে কাঠি পড়ার আগে চলে যেতাম পাহাড়ে তবে এখন দুটো মিলিয়ে মিশিয়ে হয়, কখনো বাইরে যাই আবার এখানেও থাকি, পরিবারের সাথে সময় কাটাই, সেটা সবথেকে প্রিয়, তবে ঠাকুর দেখি কাছাকাছি কোথাও আর সব থেকে ভালো লাগে পুজো মানে মানুষের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি, ঠাকুর দেখছে, প্যান্ডেলহপ করছে সেটাও একটা ভাললাগা থাকে।

Rapid fire

সাইকেলিং /মাউন্টেনিয়ারিং

- সাইকেলিং

কোনটা বেশি রোমাঞ্চকর মনে হয়? জঙ্গল সাফারি / মাউন্টেন ক্লাইম্বিং

- দুটোকে আলাদা করা যায় না, যখন যেখানে যায় সেটাই রোমাঞ্চকর মনে হয়

সোলো বাইক ট্রিপ / গ্রুপ বাইক ট্রিপ

- সোলো বাইক ট্রিপ

সাইকেল চালানোর জন্য উপযুক্ত? ভারত / সুইডেন

আসলে শুধু সুইডেন নয় সামগ্র ইউরোপ অনেক অনেক এগিয়ে আছে।

'আমার জীবনের আইডেল বলতে আমি যাকে বুঝি সে আমার বাবা' - প্রিয় ভাইন্স

হাওড়া জেলার উলুবেরিয়ার ছেলে প্রিয়রঞ্জন বিজালি ,বাংলা ইউটিউব জগতের অন্যতম কনটেন্ট ক্রিয়েটর | প্রিয় রঞ্জন থেকে প্রিয় ভাইন্স হয়ে ওঠার জার্নিটা জানবার জন্যই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। প্রশ্ন উত্তরের মাঝে দেখতে দেখতে কখন তিরিশ মিনিট ঘুরে একঘন্টা কেটে গেল বোঝা গেল না।কিন্তু তখনো আড্ডা চলছে আমাদের...

প্রিয় রঞ্জন থেকে প্রিয় ভাইন্স হয়ে ওঠার জার্নিটা কেমন ছিল যদি একটু ব্যাখ্যা করেন ?

(একটু হেসে), প্রিয় রঞ্জন থেকে প্রিয় ভাইন্স হয়ে ওঠা জার্নিটা শুরু হয় আমার উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকে । হঠাৎই ইচ্ছা হয়েছিল একটা ভিডিও করার। ভিডিওটা আপলোড করার পর স্বাভাবিকভাবে কোন ভিউজ তখন পাইনি। তারপর যখন কলেজ জীবন শুরু হয় তখন ব্যস্ততার মধ্যে প্রতিদিন ভিডিও করা সম্ভব হতো না আমার পক্ষে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে যখন ঘরে আসতাম তখন চেষ্টা করতাম একটা করে ভিডিও আপলোড করার। দু'বছর পর্যন্ত আমার চ্যানেল ঠিক তেমনভাবে দাঁড়াইনি ,সাবস্ক্রাইবার ছিল দেড় হাজারের মতো আর ভিউজ তো ওই ১৫০ থেকে ২০০ খুব বেশি হলে । একটা সময় মনে হয়েছিল যে আর হবে না তবুও আশা ছাড়িনি | বন্ধুরা বলতো কবে ভিডিও আসবে এবং অনেকের কমেন্ট আসত যে কবে ভিডিও দেবে আর কী ভিডিও আসতে চলেছে সেই থেকে আমি অনেকটা আশা নিয়ে ভিডিও করতাম।তার দু'বছর পর 2019 সালে পর পর আমার তিনটে ভিডিও ভাইরাল হয়। তারপর আস্তে আস্তে প্রিয় রঞ্জন থেকে সবার কাছে প্রিয় ভাইন্স হিসেবে পরিচিতি পাই।

হঠাৎ করে এতগুলো রোলপ্লে করার চিন্তাটা এলো কীভাবে ?

চিন্তাটা এলো বলতে বিবি কি ভাইন্স এবং আশীষ চঞ্চলানী, অনেকগুলো ক্যারেক্টার রোল প্লে করতো, মাল্টিপলস ক্যারেক্টার রোল প্লে করতো। তখন ওদের ভিডিও দেখেই আমি ভাবলাম যে আমিও ট্রাই করি। বাবা ছেলের রোল টা খুবই নতুনত্ব লাগলো আমার কাছে | একজন এতগুলো রয়েল প্লে করে তা দেখে আমিও শুরু করলাম এবং সবার ভালো লাগলো এই থেকে আমার ভাবনাটা।

যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইউটিউব চ্যানেল খুলবেন তখন পরিবার কতটা সাপোর্ট করেছিল বা তাদের কি বক্তব্য ছিল ?

(হেসে) , পরিবারের দিক থেকে সাপোর্ট প্রথম থেকেই ছিল। পরিবার বলেছিল পড়াশোনাটা ঠিক রেখে তুমি সবকিছু করতে পারো, প্রথমে পরিবার জানতোই না ইউটিউব থেকে এরকম ইনকাম করা যায়। তারপর যখন দুই আড়াই বছর পর আমার প্রথম ইনকাম আসে, তখন তারা বিশ্বাস করে যে হ্যাঁ এখান থেকেও ইনকাম করা যায় এখান থেকেও পরিচিতি পাওয়া যায়।

যখন এক লাখ সাবস্ক্রাইবার হল তখন কেমন অনুভূতি হয়েছিল আপনার?

ঐ অনুভূতিটা ঠিক বোঝাবার মতো নয় অন্য একটা অনুভূতি হয়েছিল। সেই সময় আমার মনে আছে তখন আমার ফোর্থ সেমিস্টারের ল্যাবের পরীক্ষা চলছিল। ভাইবা পরীক্ষা যখন দিচ্ছি তখন আমার ফোন আসছে তখনই বুঝতে পারি যে আমার এক লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়। তখন এক লাখ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার উত্তেজনাতে আমার মাথায় ছিল না আমি পরীক্ষা দিচ্ছি । তারপর যখন দেখলাম যে হ্যাঁ এক লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে তখন একটা আলাদাই শান্তি হয়েছিল। আর এই অনুভূতিটা কোনদিনও ভোলার নয়।

এতগুলো ভিডিও আছে আপনার, তার মধ্যে কোনটি আপনার সব থেকে পছন্দের ভিডিও ?

বাবা vs ছেলে। এটাই আমার সবথেকে পছন্দের ভিডিও |

আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ইভেন্টে গেছেন নিশ্চয়ই তো সোশ্যাল মিডিয়া ইভেন্টে গিয়ে কেমন এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে আপনার?

(হেসে) , এখনো পর্যন্ত একটা সোশ্যাল মিডিয়ার ইভেন্টে গিয়েছি, প্রথম প্রথম খুবই নার্ভাস ছিলাম তারপর সবার সাথে পরিচয় হয় কথা হয় তারপর আস্তে আস্তে নার্ভাস ব্যাপারটা কেটে যায়। বেশ ভালো ছিল মুহূর্তটা।

যদি সিরিয়াল বা সিনেমায় কোনদিনও চান্স পান তাহলে কি youtube ছেড়ে দেবেন নাকি দুটোই কন্টিনিউ করবেন ?

না আমি ইউটিউব কোনদিনও ছাড়বো না। ইউটিউব আমি সবসময় চালিয়ে যাব। ইউটিউব আমার কাছে সবকিছু ওটা কোনদিন আমি ছাড়বো না।

আপনার আদর্শ কে? যে আপনাকে প্রতিমুহূর্তে ইন্সপায়ার করে?

আমাকে প্রতিমুহূর্তে ইন্সপায়ার করে সে হল " আমার বাবা "। ওনাকে দেখে আমি প্রতি মুহূর্ত ইন্সপায়ার হই। আমি আমার বাবার লাইফের জার্নি টা দেখেছি। আমাদের একটা মেকানিক্যাল দোকান ছিল ছোট। আজ ঐ ছোট দোকান থেকে এত বড় শোরুম । আমি মনে করি আমার বাপি যদি ছোট থেকে কষ্ট করে এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারে তাহলে আমি কেন পারব না। তো আমার জীবনের আইডল বলতে আমি যাকে বুঝি সে আমার বাবা। আর আমার ইউ-টিউবের দিক থেকে আমি যার কাছ থেকে বেশি ইন্সপায়ার হয়ে থাকি সে হল বিবি কি ভাইন্স|

ছোটবেলার পুজো কেমন কাটতো ? আর বড় হওয়ার সাথে সাথে ছোটবেলার কাটানো পুজো দিনগুলো তফাৎ কতটা?

ছোটবেলার পুজো আর বড়বেলার পুজোর তফাৎ তো অনেকটাই আছে। ছোটবেলার শপিং করতে যাওয়া ,নতুন জামা কেনার যে উত্তেজনাটা' তারপর ঠাকুর দেখতে যাওয়ার আনন্দ সেগুলো একটু অন্যরকম ছিল।আর এখনই পুজো মানেই তো ঐ বেশিরভাগই ডিজিটাল। জামা অর্ডার করে দিলে জামা চলে আসে ,ফোনে দেখা যাবে কেমন থিম হচ্ছে পুজোর কত দিন বাকি আরো নানা জিনিসের।তো তফাৎ তো আছে বড় বেলার পুজো আর ছোটবেলার পুজোর।

আগামীতে যারা ইউটিউব চ্যানেল খুলতে চায় তাদের কি পরামর্শ দেবেন?

(হেসে) , প্রথমত :-youtube চ্যানেল খুলতে কারোর বাকি নেই এখন সবাই ইউটিউব চ্যানেল খুলছে আর দ্বিতীয়তো :- যদি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে চায় তাহলে তাদের বলবো যে যেমন কনটেন্ট ভালো লাগে বা যেমন টপিক ভালো লাগে তার ওপর ভিডিও করতে , তারপরে আপলোড করতে।প্রথম প্রথম অনেক লোক অনেক কিছু বলবে সেগুলো কান দিলে চলবে না। তারপর চ্যানেল দাঁড়িয়ে গেলে সবাই আপনা আপনি চুপ করে যাবে। তো আমি মনে করি নিজের যা ইচ্ছা সেটা করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের বেস্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে আপনি কাকে মনে করেন?

পশ্চিমবঙ্গের বেস্ট কনটেন্ট ক্রিকেটার তো কিরণ দা (দা বং গাই) |

আপনাকে কোন জিনিস পরিবর্তন করতে বলা হয় যা আপনার জীবনে ঘটেছে তাহলে কি পরিবর্তন করবেন ?

(হেসে), ঘটছে তো অনেক কিছুই ,সবকিছু তো পরিবর্তন করা যায় না। তো আমি মনে করি পূর্ব ঘটনা থেকেও ইন্সপায়ার হয়ে নিজেকে পরিবর্তন করা এবং আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়।

Rapid fire

ফেসবুক না ইউটিউব

ইউটিউব

বিবি কি ভাইন্স না আশিস চঞ্চলানি

আশিস চঞ্চলানি

পাহাড় না সমুদ্র

সমুদ্র

ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান না ন্যাশনাল ফ্যান

ন্যাশনাল ফ্যান | কিন্তু আমি ইন্টার-ন্যাশনাল ফ্যানেদেরও খুব ভালোবাসি।

প্রিয় ভাইন্স না প্রিয় রঞ্জন

প্রিয় ভাইন্স | কেননা প্রিয় ভাইন্স নামে বেশি পরিচিত এবং বেশি ভালোবাসা পাই |

The Bong guy না Wonder Munna

(একটু ভেবে) . দা বং গাই

সিঙ্গেল না মিঙ্গেল

(হেসে) সিঙ্গেল

মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান

স্কুল জীবন না কলেজ জীবন

(হেসে এবং ভেবে) , স্কুল জীবন।

পামেলা, রিয়া, রাইমা, নিরুপম

অনুলিখন রিয়া

স্কাউটিং: জীবনবোধের শিক্ষা

স্কাউটিং এটি একটি চিন্তাধারার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এই চিন্তাটির অধিকারী ছিলেন লট রোবাট স্টিফেন্স স্মিথ বেডেন পাওয়েল । বেডেন পাওয়েল একজন পূর্ব সেনা বাহিনীর পদকর্তা ছিলেন তিনি নিজের জীবনে বেশিরভাগ সময় গুপ্তচর হিসেবেও কাটিয়েছেন । তৎকালীন ইংল্যান্ডের যুব সম্প্রদায়ের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তখনকার সময় নেশা, মদ্যপান, ধূমপান যুব সমাজকে ভেতর থেকে শেষ করে দিচ্ছিল। তাই বেডেন পাওয়েল একটি বই লেখেন স্কাউটিং ফর বয়েজ। এখান থেকেই শুরু হয় স্কাউটিংয়ের সমাজকে পাল্টানোর যাত্রা , এর পরবর্তীকালেই ১৯০৭ সালে প্রথম ক্যাম্প গঠিত হয়। এখানে কীভাবে যুবসমাজ নিজে নিজেকে গুছিয়ে রাখতে পারবে, বাইরের বিকৃত চিন্তাধারা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে সঠিকভাবে নিজের জীব-নযাত্রাকে গড়ে তুলবে সেটারই পাঠদান শুরু হয়। বাস্তবেতে স্কাউটিং কেবল একটি বাহ্যিক বিষয় নয়, এটি একটি জীবনযাত্রার পথ। স্কাটিংয়ে শিশু থেকে বড় সকলকে একটি ছাদের নিচে আবদ্ধ করে রেখেছে যেখানে তারা বয়সের বাধা পেরিয়ে একত্রে আছে।

অনেকেরই মনে প্রশ্ন থাকে ফুটবল, ক্রিকেট জাতীয় খেলা ছেড়ে কেন তারা স্কাউটিং করব? বাস্তবেতে আমরা ক্রীড়া থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি। কিন্তু নিজের জীবনকে কী করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি সেটা আমাদের স্কাউটিং শেখায়। স্কাউটিং এর মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে তৈরি করা। একজন প্রকৃত নাগরিক হতে গেলে নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে অনুশীলন করতে হবে জীবনের সঠিক পন্থা। স্কাউটের নটি প্রতীজ্ঞা তারই প্রতীক।

Scouts and Guides Law

- A Scout/Guide is trustworthy
- A Scout/Guide is loyal
- A Scout/Guide is a friend to all and a brother/sister to every other Scout/Guide.
- A Scout/Guide is courteous
- A Scout/Guide is a friend to animals and loves nature.
- A Scout/Guide is disciplined and helps to protect public property.
- A Scout/Guide is courageous.
- A Scout/Guide is thrifty.
- A Scout/Guide is pure in thought word and deed.

এই নটি নিয়ম একটি প্রতিজ্ঞাকে ইঙ্গিত করে, যে প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে একটি স্কাউট তার সমাজকে ও তার নিজের জীবনকে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে পারে। এই নটি নিয়ম স্কাউটিং এর মেরুদণ্ড হয়ে আছে। বর্তমানে চাকুরীজীবী হোক কিংবা সমাজ জীবন মানুষকে সঠিকভাবে সেই জীবনটাকে পরিচালনা করতে হয়। যেখানে একটা সময় গিয়ে শিশুদের মধ্যে কোন পথটি ঠিক কোন পথটি ভুল সেটা নিয়ে অনেকগুলি সংশয় জন্ম নেয়। সেই সংশয় গুলি থেকেই তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

কেবল দৈনন্দিন জীবনে নয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আশা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলে যদি স্কাউট রা সেই সকল সমস্যা থেকে সাধারণ মানু-ষদেরকে বার করে আনতে পারে সেই প্রশিক্ষণও স্কাউটরা পায় । যেমন একটি স্কাউট একজন ফার্স্টেটেটার হয় তাই সে যেকোনো বিপদ থেকে মানুষকে তাৎক্ষণিক সাহায্য দিতে সক্ষম হয়। সঠিকভাবে কি করে কোন রাস্তায় হারিয়ে গেলে তার পথ থেকে বার করে নিতে হয় সেটিও একজন স্কাউট জানে কারণ স্কাউটিং এ ম্যাপিং এবং কম্পাসিং এর মত নানা বিষয়ও পড়ানো হয়। যেকোনো বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে সঠিকভাবে শান্ত মাথায় কি করে বিপত্তি থেকে বেরিয়ে আসা যায়, স্কাউটিংয়ে সেটাই শেখানো হয়, বাস্তবে বলতে গেলে স্কাউটিং মানুষের জীবনের পথপ্রদর্শক।

আশিস রায়

পুজোয় পেটপুজো

বাঙালি মানে ভোজন-রসিক, আর বাঙালির দুর্গাপুজোর সাথে খাবার দাবারের আলাদাই সম্পর্ক।আর এই উৎসবে খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর যাই হোক বাঙালি অসম্পূর্ণ। ষষ্ঠীর নিরামিষ থেকে শুরুকরে, নবমীতে কচি পাঠার ঝোল, আর দশমী তে মিষ্টি মুখ করে শেষ হয় উৎসবের পালা, আর এই পাঁচ দিন আড্ডার আনন্দের পাশাপাশি চলে অবিরাম পেটপুজো। তবে সেই একঘেয়ে মাংসর ঝোল না খেয়ে যদি অন্য রকমের একটা পদ রাধা হয় তাহলে নবমীর ভুরিভোজ একেবারে জমে যায়।

নতুনত্ব মটন রেসিপি

উপকরণ : মটন (১ কেজি), টক দই (২০০গ্রাম), হলুদ গুড়, লঙ্কা গুড়, জিরে গুড়, ধনে গুড়, নুন (পরিমাণ মত), কাশ্মীরি লঙ্কা গুড়, কাজু বাদাম বাটা (১০-১২ টা), আদা, রসুন বাটা (পরিমাণ মত), আওয়াদী মশালা (জিরে, গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, জৈয়ত্রী, জায়ফল, স্টারফল, শুকনো খোলায় নেড়ে গুড় করে নিতে হবে), বেরেস্তা গুড়, ।

প্রণালী : প্রথমে একটি পাত্রে মাংস টক দই, আদা রসুন বাটা, হলুদ গুড়ো লঙ্কার গুড়ো জিরে গুড়ো, ধনে গুড়ো, নুন পরিমাণ মত ও কাশ্মীরি লঙ্কার গুড়ো দিয়ে, মেরিনেট করে রেখে দিতে হবে। এরপর কড়াইতে পরিমাণ মত তেল দিয়ে, একটু গরম হয়ে এলে ফোড়নে তেজপাতা৪-৫ টা এলাচ, দারচিনি দিয়ে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে কশাতে হবে, এরপর বেরেস্তা গুড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে, মাংস থেকে তেল বেরিয়ে গেলে, বেটে. রাখা কাজু বাদাম দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে নেড়েচেরে কষিয়ে গরম জল ঢেলে দিতে হবে, এবং মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে, তাতে আওয়াদী মশালা দিয়ে কিছুক্ষন নাড়াচাড়া করে নিয়ে , তাতে স্লাইস করে কাটা আদা, ধনে পাতা ও একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে সার্ভ করুন আওয়াদী মটন। গরম গরম বাসন্তী পোলাও এর সাথে আওয়াদী মটন। খেলে মন ভোরে যাবে।

কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি ,তাহলে মাংস দিয়ে কি আর মন ভরে পাতে তো মাছ থাকতেই হবে ,জেনেনি সেরকমি একটি নতুনত্ব রেসেপি।

কলা পাতায় চিংড়ি পিঠে

উপকরনঃ চিংড়ি মাছ (৩০০গ্রাম), নারকোল কোরা (১ টা) ,হলুদ গুড়ো , নুন, চিনি (পরিমান মত) একটা কলাপাতা, সরষের তেল, কাঁচা লঙ্কা ,

প্রণালীঃ চিংড়ি মাছ গুলো ভালো করে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে তারমধ্যে হলুদ গুড়ো , নুন পরিনাম মত , চিনি পরিমান মত, একটি গোটা নারকেল কোড়া,সরষের তেল , কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে । কলাপাতা তে সরষেসেতেল মাখিয়ে তাতে চিংড়ি মাছের মাখাটা দিয়ে কলা-পাতাটিকে ভাঁজ করে সুতো দিয়ে বেঁধে নিতে হবে । চাটু তে সামান্য পরিমান তেল দিয়ে তাতে কলাপাতায় মোরা চিংড়িমাছটা দুপিঠ ভাল করে ভেজে নিলেই তৈরি কলাপাতায় চিংড়ি পিঠে। গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন কলাপাতায় চিংড়ি পিঠে।

হরেক রকম খাবার খেলেও বাঙালির আর যাই হোক শেষ পাতে মিষ্টি সবারই চাই, আচ্ছা, সেই একইরকম রসগোল্লা, রাজভোগ, বাদ দিয়ে যদি অন্য রকম মিষ্টি হয় তাহলে খুব একটা মন্দ হয় না, চলুন জেনেনি মিষ্টি জাতীয় এক রেসিপি।

চালের বরফি উপকরনঃ চাল (২৫০ গ্রাম) , চিনি(২৫০ গ্রাম), নারকেল (ছোটো একটা) , জল (পরিমান মত) নুন (পরিমান মত)

প্রণালীঃ প্রথমে চাল টাকে সামান্য পরিমান নুন দিয়ে কড়াইতে ভাল করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ ব্রাউন রঙের হচ্ছে। তারপর ভাজা চালটা মিক্সি তে গুড়ো করে নিতে হবে। কড়াই তে জলে নারকেলের টুকরো গুলো দিয়ে ফোটাতে হবে যতক্ষণ না সিদ্ধ হচ্ছে । নারকেল গুলো সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তাতে চিনি দিয়ে ফোটাতে হবে। জল ফুটে এলে তাতে চাল গুড়ো দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে জমাট বেঁধে না যায়। ভালো ভাবে মিশিয়ে নিয়ে থালায় সামান্য পরিমান সাদা তেল মাখিয়ে নিয়ে ঢেলে দিতে হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বারফির মতও টুকরো করে পরিবেশন করুন চালের বারফি।

মৌপিয়া, সুদিপ্তা

হার না মানলে জয় নিশ্চিত

২০২৩ এর ২৩ সে আগস্ট কে জাতীয় মহাকাশ দিবস বলে ঘোষণা করা হলো। এটি কেবল মাত্র সম্ভব হয়েছে ইসরোর ক্লান্তিকর প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে। ইসরো হলো ভারতীয় মহাকাশ ঘোষণা কেন্দ্র। ইসরোর পূর্ব বর্তি নাম ছিল ন্যাশেনাল কমিটি অব স্পেস রিসার্চ (ইনকোস্পার)। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে এর নাম পাল্টে ইসরো হয়ে ওঠে। ইসরো নিজের প্রথম সাফল্য লাভ করে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ "আর্যভট্ট" তৈরি করে। যা "সোভিয়েত ইউনিয়নের" দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৯ সে এপ্রিল উৎক্ষেপন করা হয়।

এর পর থেকেই চলতে থাকে ইসরোর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম যা ভারত কে আজ এত বড় সাফল্য ও সম্মান এনে দিয়েছে। এক নজরে ইসরোর চন্দ্রযান অভিযান গুলি ফিরে দেখা যাক। এবং দেখা যাক এত গুলো ব্যর্থতার পরে হার না মেনেও সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতের মাহাত্ম গোরে তোলার অভিযান।

ISRO(Indian space reserch organization)।
ইসরোর প্রথম চেয়ারম্যান ড. বিক্রম সারাবাই ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রথম চেয়ার ম্যান অনুরোধে জওরলাল নেহেরু এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসরোর চন্দ্র অভিযান গুলি ফিরে দেখা যাক।

ISRO র প্রথম চাঁদে অভিযানের জন্য চন্দ্রযান -১ লঞ্চ করা হয়। এটি চাঁদের মাটিতে সফল ভাবে পদার্পণ করে কিন্তু কোনো একটি সমস্যা জনিত কারণে সেটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।এরপর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চন্দ্রযান-২ আর পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়।

.চন্দ্রজন -২ (GSLV MK3 M1)
উথক্ষেপন:- ২০১৯- এর ২২ এ জুলাই হয়। এর ল্যান্ডারের নাম ছিল বিক্রম। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদে জলের অবস্থান এবং প্রাচুর্যতা নিয়ে মানচিত্র তৈরি করা ।ইসরো র তথ্য অনুযায়ী,এই অভিযানটি বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরীক্ষা - নিরিক্ষা করবে।সম্পূর্ণ পক্রিয়াটি রোভার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং রোভার সমস্ত তথ্য চাঁদের কক্ষপথে থাকা " কৃত্রিম উপগ্রহ" এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠাবে । চান্দযান - 2 এর ওজন ছিল ৩,৮৫০ কেজি (৮,৪৯০পাউন্ড) ভরের উত্তোলন সহ।
মাত্রা - ৩.২*৫.৮*২.২ মিটার।
স্তুল ভরের উত্তোলন: ২,৩৭৯ কেজি (৫,২৪৫ পাউন্ড)।
চালক যন্ত্রের ভর: ১,৬৯৭ কেজি(৯,৭৪১পাউন্ড)
শুকনো ভর: ৮২কেজি (১৮১ পাউন্ড)
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা: ১০০০ ওয়াট।

অভিযানের সময় কাল: চন্দ্র কক্ষপথে ১ বছর, যা বৃদ্ধি করে ২ বছর করা হতে পারে। চান্দ্রযান ২ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য গুলি ছিল চন্দ্র পৃষ্ঠের নরম জমির সক্ষমতা প্রদর্শন করা এবং একটি রোবোটিক রোভার পরিচালনা করা। বৈজ্ঞানিক লক্ষ গুলির মধ্যে চান্দ্র ভুসংস্থান, খনিজ বিদ্যা, মৌলিক প্রাচুর্য্য,চন্দ্র অক্সোস্ফিয়ার এবং হাইড্রফিল ও চন্দ্র জলের সাক্ষর গুলির অধ্যয়ন অন্তভুক্ত কক্ষপথ চন্দ্র পৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরি করবে এবং এর ৩ টি মানচিত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করা। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে চন্দ্র জলের এবং পৃষ্ঠের চন্দ্র রেগলিথের বেধ অধ্য-য়নকালে র্যা ডার টি পৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরি করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনক ভাবে অবতরনের সময় আই এস টি রাত ১:৫২ টার দিকে ল্যান্ডার চন্দ্র পৃষ্ঠের প্রায় ২.১ কিলোমিটার (১.৩ মাইল) উচ্চতায় নিজের লক্ষপথে বিচ্যুত হয় এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে চন্দ্রযানটি ব্যার্থতার সম্মুখীন হয়।কিন্তু ৮ টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিয়ে অভিযানের অপর অংশ অর্বিটার্টি সচল রয়েছে তখনও। আবার চাঁদের সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য এটি বছর ব্যাপী অভিযান চালাবে।

চন্দ্রজন -৩ (LMV 3 - M4/FAT BOY) : উৎক্ষে-পনকারী এল ভি এম ৩ রকেটকে এম ৪-হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। চন্দ্রজান - ৩ মহাকাশ যানটি প্রপালসান মডিউল , ল্যান্ডের (বিক্রম) ও রোভার নিয়ে গঠিত ছিল।
চান্দ্রজাণ - ৩ র মোট ওজন (৩৯০০ কেজি)। প্রপেলার মডিউলটির ওজন (২১৪৮ কেজি)। রোভার সহ ল্যান্ডের মডিউলটির ওজন (১৭৫২ কেজি)।
চান্দ্রযান 3 মিশন এর মত খরচ ৬১৫ কোটি টাকা। ১৪ জুলাই, ২০২৩ এ চন্দ্রযান - ৩ অন্ধ্রপ্রদেশ এর শ্রীহরিকোটা র সতীশধোওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপন করা হয় এবং সেটি নিদিষ্ট কক্ষপথে প্রবেশ করে। চন্দ্রযান- ৩ এর সঙ্গেই রাশিয়ার জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা লুনা - ২৫ মিশনটি ১০ - আগস্ট,২০২৩,২৩:১০ UTC এ রাশিয়ার সুদুর পুর্ব আমুর অঞ্চলে ভাস্তচিনি কস্মাদ্রম থেকে একটি সয়ুজ ২.১ বি রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপন করা হয়। মাত্র ১০ দিনে পৌঁছে গিয়েছিল চাঁদের অর্বিটে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। শেষল্যাপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল রাশিয়ার মহাকাহজান লুনা ২৫।

এরপরেই গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের চন্দ্রজাণ ৩। রাশিয়ার লুনা ২৫ ব্যার্থ হওয়ার পর ভারতবাসী সহ সমগ্র বিশ্ব টান টান উত্তেজনা নিয়ে চোখ রাখতে থাকে চন্দ্রযাণ ৩ এর উপর। সমগ্র বিশ্বের মনে প্রশ্ন ও বিভিন্ন মতামত উঠে আসে চন্দ্রজান ৩ কে নিয়ে । পুরো বিশ্বকে অবাক করে ও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ২৩ আগস্ট ৬:০৪ মিনিটে ভারতের চন্দ্রজান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মাটি স্পর্শ করে। ভারতকে গৌরবময় একটি সন্ধ্যা উপহার দেয়। ভারতকে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফল ভাবে সফট ল্যান্ডিং করা দেশ হিসেবে। এবং একই সঙ্গে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের মহাকাশ যান চাঁদে অবতরণ করেছে। " কথায় আছে নেড়া বেল তলা যায় একবার " কিন্তু ভারত চাঁদ জয় করল তিনবারে। সুমনের সেই বিখ্যাত গান "হাল ছেড়না বন্ধু" কথাটা আজ গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের বৈজ্ঞানিকরা এই মিশন এর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিল। ভারত চাইলে সব কিছু করতে পারে। ভারতের এই চন্দ্রঅভিযানটি সারা ভারত বাসীর কাছে একটা গৌরব ময় ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবে।।

আকাশ দে, রুম্পা কামিলা, চিরদীপা বোস, শুভেন্দু নস্কর (1st Semester)

ভুত বলে কী সত্যি কিছু আছে? এই বিষয়ে কী বলছে মনোবিজ্ঞান

মৃত্যু কি শেষ? নাকি মৃত্যুর পরও শুরু হয় আর এক অধ্যায়!! তাহলে সত্যি কি আত্ম বলে কিছু আছে?? নাকি ভুত / আত্ম বলে আদতে কিছুই হয় না, সব কিছুই মস্তিষ্কের ভ্রম!!

ড: কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের পড়ুয়া আর্য সাহা, আমতা পাঁতিহালে তাদের পূর্বপুরুষের বাস, বাড়িটা আর্য ঠাকুরদার বাবা তৈরি করেন ১৩৬১ সালে, প্রায় ৭০ বছর হয়ে গেলো বাড়িটির আয়ু, আর্যর কথা অনুযায়ী, সে তার দাদুর মুখে শুনেছিল, আগেকার দিনে বাড়ি বানানোর পর অশুভ শক্তি বাড়িতে না ঢুকতে পারে তাই হোমযজ্ঞ করা হত, তাদের বাড়িটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু কিছুদিন হল তার এর সাথে কিছু অবাস্তবিক ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনাগুলি আভাস সে বর্তমানে পেলেও এর সূত্রপাত হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই, আর্যর বক্তব্য অনুযায়ী এইরূপ ঘটনা প্রথম ঘটেছে - সেই দিন বাড়িতে কারেন্ট ছিল না রাতে সবার খাবার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে যেই ওপরে যাবে ঠিক তখনই কেউ যেনো রান্না ঘরে ঢুকে গেলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে আর্যর সাথে কেউ ছিল না, হঠাৎ শুনতে পেলো রান্না ঘরে সব বাসন গুলো যেনো হুরমুরিয়ে পরে গেলো, তবে বাসন পরে যাওয়ার শব্দ আর্য ছাড়া আর কেউ পায়নি , তখন রান্না ঘরে গিয়ে দেখলো যে যেমনটা তার মা সব বাসন গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলো সব কিছু তেমনি আছে, মনের ভুলই ভেবেছিল, তবে তার সেই ধারণা ও বদলে গেলো, কিছুদিনের আগের ঘটনা, আর্য কলেজ থেকে সবে ফিরেছে, অনেকটা সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখলো বাড়ির কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে অন্ধকার, ইতিমধ্যে কারেন্ট ও চলে গিয়েছে, বেশ অনেকবারই জোরে জোরে ডাকলো "মা" কিন্তু কেউই সারাদিলো না, কেমন যেনো গা ছমছমে পরিবেশ, অস্বস্তি হতে লাগলো তার ইতিমধ্যে কারেন্ট চলে এলো, মাও ওপর থেকে নেমে এলো, ব্যাপারটা আর্য ওভার থিঙ্কিং মনে হলো, সব কিছু মাথা থেকে বের করে সে ওপরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে,এতটাই ক্লান্ত ছিল যে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়লো, রাত ১০ টা নাগাদ ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে ঘুমানোর চেষ্টা করলো আর্য , চোখ বন্ধ করতেই মনে হলো, মুখের সামনে তাকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, একদম নরাচরা করতে পারছিলো না, যেনো মনে হচ্ছিল কেউ তাকে চেপে ধরে রেখেছে, কিন্তু চোখ খুলতে আর কেউ নেই, আবারো চোখ বন্ধ করলো, বুঝতে পারলো, কেউ যেনো তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে, ভয়ে চোখ টা খুলতে দেখলো কে যেনো দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, ভয়ে উঠে বসলো সে , গলাটা ততক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছিলো, জল খেয়ে ভয়ে ভয়ে আবারো শুয়ে পড়লো, কিন্তু সেই রাত টা আমি আর ঘুমাতে পারিনি।

পরের দিন সকাল সকাল নিচে নেমে এসে সবাইকে ঘটনা বলাতে, সবাই একটু অবাকই হয়ে গেলো, সেই দিনের সারাদিনটা কোনো রকম অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়াই কেটেছিল, কিন্তু সন্ধে নামতে সেই গা ছমছমে পরিবেশ, ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ১ টা আর্য জল আনার জন্য নীচে গেল, জল নিয়ে ওপরে যেই আসবে, তাকে যেনো কেউ ঠিলে ওপরে চলে গেলো, হাত থেকে জলের বোতল টাও পরে গেলো, সে তাড়াতাড়ি করে ওপরে এলো, তার মনে হলো ওপরে ছাদে কেউ হাঁটা চলা করছে, বেড়াল বা অন্য কোনো পশু হাঁটা চলা নয়, স্পষ্ট মনে হলো কোনো মানুষের, সবার ঘোরে গিয়ে দেখলো সবাই শুয়ে আছে তাহলে ওপরে কে সেটা দেখতেই ওপরে এলো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না, অথচ সেই হাঁটা চলার শব্দ সে তখনো অবধি শুনতে পাচ্ছি, ভয় পেয়ে নিচে গিয়ে শুয়ে পড়লো আর্য, ততক্ষণে আবার সবকিছু সাধারণ হয়ে গিয়েছে, আর ভোরের আলো ফুটে গিয়েছিল, না আর ভয় না পেয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলো সত্যি কি তার সাথে এই ঘটনা গুলো ঘটছে, নাকি সব কিছুই তার মনের ভুল থেকে, আবার এটাও ভাবলো এতটা মনের ভুল কি করে হতে পারে তার, সেই দিনের ঘটনাটা আর কাউকে কিছু বললো না আর্য , দেখলো সব কিছু স্বাভাবিকই আছে, তাহলে কী শুধু তার সাথে এসব ঘটনা ঘটেছে!! হ্যাঁ তার কারণ হল.....
সাধারণত মানুষ অন্ধকার, একাকী, পরিবেশে ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করে, সেই সময়ে মস্তিষ্কের সৃষ্টিকরা বস্তু, বাস্তবতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবনতা বেশি থাকে, মস্তিষ্কের বাস্তবতার চিত্র কখনো কখনো এমন পর্যায়ে চলে যায় যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল থাকে না, যেমন, হঠাৎ বাসন পরে যাওয়ার শব্দর সাথে অদতে বাস্তবের কোনো মিল নেই। এছাড়া মস্তিষ্কের ঘুমিয়ে পড়া ও জেগে ওঠার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত দেখা যায় যার জন্য আমরা অদ্ভুত কিছু অনুভব করি, এবং অধ্যাসের কারণে আমরা ভুল প্রতক্ষন করে থাকি, যেমন হাঁটা চলা, করার শব্দ, কেউ ঠিলে চলে যাচ্ছে এমন কিছু, হয়ত নিজেই পরে গেছি, কিন্তু মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলার জন্য ভুল প্রত্যক্ষিকরন।

এর পর আসি সেই রাতের ঘটনায়, ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করতে না পারাটাকে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় "স্লিপ প্যারালাইসিস" বলে বা ঘুমের পক্ষাঘাত। এটি এমন একটা অবস্থা যখন কেউ সজাগ অবস্থাতে থাকে তখন নিজেকে নিশ্চল মনে করে, নড়াচড়া করতে পারে না, তখন এমন কিছু দেখতে বা অনুভব করতে পারে যার কোনো অস্তিত্ব —নেই, যাকে বলে হ্যালুসি-নেশন।
ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজের স্নায়ুবিজ্ঞানী বালান্দ এর মতে - স্লিপ প্যারালাইসিস হলো চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন দেখার মতো। এই যে অন্ধকারে কেউ যেন বেরিয়ে চলে গেলো, কেউ ঠেলে দিয়ে গেলো।
ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থামব্রিয়ার মনোবিদ ডেভিড স্মাইলেস এর মতে , এসব এক ধরনের হ্যালুসিনেশন। তিনি বলেন, প্রায় সবারই এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষ এটি উপেক্ষা করেন, আবার কেউ কেউ ভাবেন এটা ভূতের কাণ্ডকারখানা।আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় সঠিক তথ্য দেবে এমনটা ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত। তাই আমাদের হ্যালুসিনেশনের অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হলে, সেটা সবসময় আমরা বাস্তবতার রূপ দিই।

মানুষের মস্তিষ্ক সব থেকে উন্নত, যার কারণে কখনো কখনো কিছু অর্থহীন জিনিসেরও অর্থ খুঁজে পায়। একে বলা হয় প্যারিডোলিয়া। যেমন ভেসে যাওয়া মেঘের মধ্যে তাকিয়ে কখনও কোনো পশুপাখি,বা কোনো মানুষের মুখ কল্পনা করা। তাই কখনো এমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়, যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল থাকে না, যা আমাদের চোখে আমাদেরই মস্তিষ্ক একে দেয়।

তবে বর্তমানে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তির কারণে মানুষের মধ্যে ভৌতিক অলৌকিক, এই সব বিষয়ে বিশ্বাসের প্রবনতা কম। বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীদের অতিবিশ্লেষণাত্মক মনোভাব, বর্তমানে অধ্যায়নে ভৌতবিজ্ঞান গণিতের কৌশল ভূত বা অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস অনেকটাই কম, আর্য তার ব্যতিক্রম নয়, সেও কোনো দিন ভাবতে পারেনি তাকে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তবে যতই বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আরো উন্নত পরিকাঠামো আসুক না কেনো, কিছু কিছু মানুষের এই ধারণা বদলাতে পারেনি।

মনোবিজ্ঞানী টাইসন এর মতে - ভৌতিক বা ভূতের ঘটনা, গল্প হিসেবে শোনা উচিত, তার সাথে বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, আবার তিনি এও বলেছে, বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত অনেকের মধ্যে অলৌকিক বিষয় নিয়ে বিশ্বাস করার প্রবণতা দেখা গেছে।

তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আলো যেমন আছে তার বিপরীতে অন্ধকার ও আছে, তাই এই বিশ্বে শুভ শক্তি ও যেমন আছে, অশুভ শক্তি ও আছে, হ্যাঁ সেটা হয়তো 'ভূত,' 'প্রেত' , নয় তবে কিছু একটা শক্তি অবশ্যই আছে।

Arjobrata Saha(3rd Semester)
Sudipta Koley(5th Semester)

হাওড়ার কিছু অলৌকিক জনশ্রুতি : লৌকিক নাকি অলৌকিক

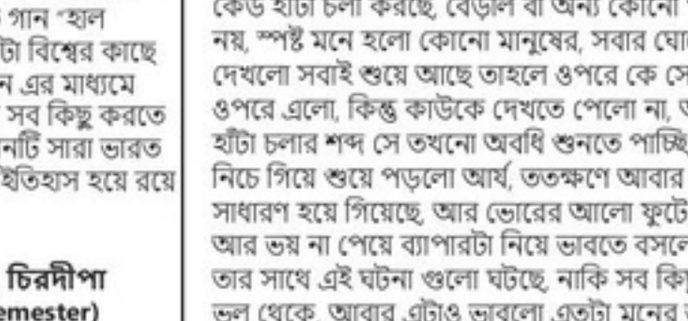

কথায় আছে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ভূত মানেই অদ্ভুত। ভূত শব্দটার মধ্যে রয়েছে অজানা রহস্য। গা ছম ছম করা ভাব। অদৃশ্য, অলৌকিক, কাল্পনিক অবয়বটি কি আসলেই আছে! অনেকেই মনে করেন ভগবান আছে মানে ভূতের অস্তিত্বও সম্ভব।
আসলে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর । তবে আজও কিছু পুরোনো জনশ্রুতিতে কান পাতলে এইরূপ অনেক ঘটনাই শোনা যায় , তেমনই হাওড়ার আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করে এমন কিছু অলৌকিক জনশ্রুতি।

১) হাওড়া ব্রিজের নীচে মল্লিক ঘাট ফুল বাজারের নিকটবর্তী ঘাটটিতে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁদের অনেকেই বলেন, এই ঘাটে নাকি প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটে। রোজই প্রায় অনেক মৃত্যু দেখে এই ঘাট। কোনও মহিলাকে সাদা শাড়ি পরে ঘুরতে দেখেছেন কিংবা মহিলার গলায় নাকি সুরে কান্না শুনেছেন— এমন দাবি স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই করে থাকেন। অনেকেই নাকি দেখেছেন, ভোররাতে নাকি এই ঘাটের ধারে জলের নিচ থেকে দুই হাত বাড়িয়ে কাউকে ডাকতে দেখা গিয়েছে। তাদের ধারনা যারা এখানে মারা গেছেন তাদের আত্মাই ঘুরে বেড়ায়।

২) হাওড়ার জগাছায় টস কোম্পানির চায়ের ব্যাবসায়ের বাড়বাড়ন্ত আজ সর্বজনবিদিত। কথিত আছে এর পিছনে আছে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা । টস কোম্পানির বাড়ি তৈরির জন্য যে জায়গা কেনা হয় সেটার মধ্যে একটি মাজার পরে যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও এই পরিবার এই মাজারটি প্রতিপালন করেন, ফলস্বরূপ তাদের ব্যবসার উন্নতি হতে শুরু করে, তারা বছরে একবার যেমন ধুম করে জগদ্ধাত্রী পূজা উদযাপন করেন তেমনি ইসলাম মেনে মাজারটিতেও উৎসব হয় । অথচ স্হানীয় মানুষের আনাগোনা সেই জায়গায় নেই, কারন প্রেতাত্মার প্রভাব আজও মানুষকে ভীত করে রেখেছে, তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকে পাছে তাদের উপর প্রেতের প্রকোপ আসে ।

৩) শিবপুরের ব্যানার্জী বাড়ি প্রাচীন হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলের সকলের মুখে মুখে ফেরে বি কে পাল স্কুলের পিছনের দিকে যে ব্যানার্জী পরিবারের বিশাল অট্টালিকা আজকেও বিরাজমান তার ইতিহাস ঘাটলে এক মর্মান্তিক কাহিনী শোনা যায় । গিরিশ ব্যানার্জী পেরো থেকে কাঠের ব্যবসার উন্নতি করে বেশ পসার জমিয়ে প্রায় দেড়শো বছর আগে শিবপুরে একটি বাড়ি করার জন্য উদ্দোগী হন । এই পরিবারের একজন হলেন এম এল এ অম্বিকা ব্যানার্জী এবং আরেকজন শক্তি ব্যানার্জী- তিনি বিখ্যাত চিত্রপরি-চালক সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান হিসাবে প্রথিত । কিন্তু এই বাড়ি করার সময় অনেক গাছ কাটা পড়ে, কথিত আছে সেই গাছে বাস ছিল এক অশরীরীর এবং তার বাসায় হাত পড়তেই সে বেজায় চটে যায় । কথিত আছে গিরিশ ব্যানার্জী বাড়ি নির্মাণের পরে তার কনিষ্ঠ সন্তানকে এই অশরীরীর বলি হতে হয় । ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের প্রতিশোধ নিতে ভোলেনি সেই অশরীরী । পরবর্তীতে আস্তে আস্তে পরিবারের মানুষ এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র নিজেদের আবাস গড়ে তুলতে বাধ্য হয় । আজও এই বাড়ির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ।

শুধুমাত্র এই কটি জায়গাই নয়, হাওড়া এবং হাওড়া সংলগ্ন এলাকায় এরকম অনেক ভৌতিক জায়গা রয়েছে যার কাহিনী আমরা অনেকেই জানি না, আবার অনেকর বেশ কিছু ঘটনাই জানা, যেমন হাওড়ার ব্রিজ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন অঞ্চল প্রমুখ স্থানে বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনা ,আত্মহত্যা, দুর্ঘটনার কবলে প্রান হারাতে হয় অনেককে, তবে এর পর! অনেকের মনে সেই ভৌতিক ধারণা টা থেকে যায়, কোনো ভৌতিক ঘটনার পিছনে সবসময়ই কোনো না কোনো অলৌকিক ঘটনা থাকে, সেই অলৌকিক ঘটনাগুলি থেকে জন্ম নেয় অলৌকিক চরিত্ররা ।

সুচরিতা, রাহুল (5th Semester)
বিদিপ্তা (3rd Semester)

#ISS BAAR SAU PAAR

ASIAN GAMES 2K22

Sport	Gold	Silver	Bronze	Total
Shooting	7	9	6	22
Rowing	0	2	3	5
Cricket	1	0	0	1
Sailing	0	1	2	3
Equestrian	1	0	1	2
Wushu	0	1	0	1
Tennis	1	1	0	2
Squash	1	0	1	2
Athletics	2	5	5	12
Golf	0	1	0	1
Boxing	0	0	1	1
Badminton	0	1	0	1
TOTAL	13	21	19	53

HIGHLIGHTS

•এশিয়ান গেমসে মেডেল তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। শক্তিশালী চিন, জাপান ও কোরিয়ার পরেই রয়েছে ভারত।

অলিম্পিক্সের আগে দেশকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শুটাররা
১৯৫৪ সালে এশিয়ান গেমসে শুটিং মেডেল ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ভারত নিশানাবাজিতে ৯টি সোনা, ২১টি রুপো ও ২৮টি ব্রোঞ্জ-সহ সাকুল্যে ৫৮টি পদক জেতে। এবার ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ভারত শুটিং থেকে ৭টি সোনা, ৯টি রুপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ২২টি পদক জেতে। অর্থাৎ, আগের সবগুলি আসর মিলিয়ে ভারত শুটিং থেকে মোট ৯টি সোনা জেতে। এবার একটি আসর থেকেই ভারত জিতে নেয় ৭টি সোনা।

৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে শুধু সোনা জয়ই নয়, এশিয়ান গেমসে রেকর্ড গড়ে ফেললেন অবিনাশ। জাপানের রিয়োমা আওকিকে হারিয়ে সোনা জেতেন অবিনাশ। তিনি দৌড় শেষ করেন ৮ মিনিট ১৯.৫০ সেকেন্ডে।

এশিয়ান গেমসে পুরুষদের শট পাটে সোনা জিতলেন তেজিন্দরপাল সিং তুর। ২০.৩৬ মিটার দূরত্বে শট পাট ছুড়ে দেশকে এবারের গেমস থেকে ১৩তম সোনা এনে দিলেন তিনি। এই নিয়ে অ্যাথলেটিক্স থেকে এল দ্বিতীয় সোনা।

Till 1st october, 8th day

বাংলায় এবার লা লিগা

এখন ভারতীয় ফুটবলের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন ফুটবল মহল। জাতীয় ফুটবল দল সম্প্রতি পরপর তিনটে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে বাংলা থেকে সেই ভাবে কোনও উল্লেখযোগ্য মুখ ফুটবল দলে উঠে আসেনি। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানের মতো ঐতিহ্যবাহী দল। এই বাংলা থেকে চুনি গোস্বামী, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বনামধন্য ফুটবলাররা তৈরি হয়েছেন। যারা ভারতীয় ফুটবল দলকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে ময়দানের তিন প্রধান ছাড়া সেইভাবে বাঙালি ফুটবলারদের দেখা যায় না। সেখানেও এখন বিদেশীদের আধিক্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফরের মাঝেই স্পেনের বিখ্যাত ফুটবল আয়োজক সংস্থা লা লিগার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় লা লিগা পশ্চিমবঙ্গে তাদের একটি অ্যাকাডেমি খুলবে। যেখানে স্থানীয় প্রতিভাদের তুলে এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। লা লিগায় অ্যাকাডেমি নিয়ে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লা লিগার সভাপতি জাভিয়ের তেভাসের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই রাজ্যের ফুটবল জগতের উন্নতিতে যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই জন্য লা লিগা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে একটি মাঠ চেয়ে আবেদন করে। এবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সন্তোষপুরের কিশোরভারতী স্টেডিয়াম তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে সেই সিধান্তে সিলমোহর দিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রিসভাও। অ্যাকাডেমিতে মহিলা ফুটবলারদের ট্রেনিং দেওয়া হবে বলেও জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রে। আশায় বুক বাঁধছে বাংলার ফুটবল কমিউনিটি।

বিশ্বকাপ বুলেটিন

৫ অক্টোবর থেকে শুরু এই মেগা টুর্নামেন্ট। ইতিমধ্যেই চলছে প্রস্তুতি ম্যাচ। ভারত প্রথম মাঠে নামবে ৮ অক্টোবর। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ফাইনাল ১৯ নভেম্বর।

ভারতের ১২টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে উদ্বোধনী ম্যাচ হবে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। ফাইনাল ম্যাচও অনুষ্ঠিত. হবে সেখানেই। শুধু তাই নয়, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচও হবে আমেদাবাদে।

ভারতের ম্যাচ কবে কখন?
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ৮ অক্টোবর, চেন্নাই
ভারত বনাম আফগানিস্তান ১১ অক্টোবর, দিল্লি
ভারত বনাম পাকিস্তান ১৫ অক্টোবর, আমেদাবাদ
ভারত ভারত বনাম বাংলাদেশ ১৯ অক্টোবর, পুণে
ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ২২ অক্টোবর, ধর্মশালা
ভারত বনাম ইংল্যান্ড ২৯ অক্টোবর, লখনউ
ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ নভেম্বর, কলকাতা
ভারত বনাম আফগানিস্তান ১১ নভেম্বর,
ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস ১২ নভেম্বর, বেঙ্গালুরু

ক্রীড়া প্রতিবেদক : আশিস রায় (5th Semester)
ছবি : গুগল

গ্যালারি

Departmental T-shirt Inauguration

ছবি : রাহুল সাহা
(5th Semester)

13/07/2023

ক্রিয়েটিভ কর্নার

মনীষ প্রামানিক (5th Semester)